সার সংক্ষেপ

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৫

মানব উন্নয়নের জন্যে ‘কর্ম’

প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের মূল বার্তা হলো মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ বা শ্রম মৌলিক চালিকাশক্তি। প্রতিবেদনটির প্রচ্ছদ পটভূমি লক্ষ্য করলে যে চিত্র দেখা যাবে তা একটি প্যানেলের মাধ্যমে বিশ্বের ১৫৬টি দেশের ৯৮ শতাংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে গত ২৫ বছরে, বেশি দেশ ও মানুষ স্বল্প মানব উন্নয়নের ধারা (১৯৯০ সালে, ৬২টি দেশের ৩০০ কোটিরও বেশি মানুষ থেকে শুরু করে ২০১৪ সালে ৪৩টি দেশের ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ) থেকে বের হয়ে ক্রমান্বয়ে অধিক ও উচ্চ মানব উন্নয়নের ধারায় (১৯৯০ সালে, ৪৭টি দেশের ১২০ কোটিরও বেশি মানুষ থেকে শুরু করে ২০১৪ সালে ৮৪টি দেশের ৩৬০ কোটিরও বেশি মানুষ) প্রবেশ করেছে। পটভূমিতে নীচের হাল্কা নীল রঙের অংশটি উপস্থাপন করে প্রথম ধারাটি আর উপরের সবুজ অংশটি উপস্থাপন করে দ্বিতীয় ধারাটি। প্রচ্ছদের পটভূমিতে, বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমজীবী মানুষের যে বৃত্ত দেখা যায় যার ব্যাপ্তি ঘরের কাজ থেকে শুরু করে সৃষ্টিশীল কাজ, সেবামূলক কাজ পর্যন্ত, এটি তাই মনে করিয়ে দেয় যে তাদের শ্রম শুধু মানব উন্নয়নে নয় কাজের বৈচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের শ্রমের যৌথ ক্রিয়ারও যুগলবন্দী।

Copyright©2015
By the United Nations Development Programme
1 UN Plaza New York, NY 10017, USA

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced stored in retrieval system or transmitted, in any from of by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission

For a list of any errors of omissions found subsequent to printing. please visit our website at http://hdr.undp.org

Printed By:printcraft Company Limited
50/4, West Hazipara, Rampura, Dhaka- 1219. Tel: 9342954

সার সংক্ষেপ

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৫

মানব উন্নয়নের জন্যে ‘কর্ম’

জাতিসংঘ
উন্নয়ন
কর্মসূচি’র
(ইউএনডিপি)
জন্যে
প্রকাশিত

Empowered lives.
Resilient nations.

মুখবন্ধ

২৫ বছর আগে ১৯৯০ সালে প্রথম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন খুব সাধারণ একটা চিন্তা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তা হলো জীবনে চলার পথে বেছে নেয়ার সুযোগ বাড়ানো। যে কোনো অবস্থানে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে যে কয়েকটি পথ খোলা থাকে, মানব উন্নয়নের মূলমন্ত্র অনুযায়ি সেই পথের সংখ্যা যত বাড়বে ততই বিকশিত হবে জীবন। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল স্থুলভাবে শুধু অর্থনীতির কলেবর না মেপে সূক্ষ্মভাবে মানব জীবনের সমৃদ্ধি মাপার চেষ্টা করা। শ্রম সবসময়ই মানব উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত হিসেবে গণ্য হতো কিন্তু শ্রমের গুরুত্ব বরাবরই মানব বিকাশের চেয়ে একে অর্থনৈতিক উন্নয়নেই বেশি পেয়েছে। তবে ২০১৫-র মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন শ্রমকে মানব জীবনের সেই সমৃদ্ধির সাথে সরাসরিভাবে যুক্ত করেছে।

প্রতিবেদনটি শুরু হয়েছে মৌলিক প্রশ্ন দিয়ে - শ্রম কিভাবে মানব উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে? প্রতিবেদনটি শ্রমকে দেখেছে আরো প্রশস্ত আঙ্গিকে। চাকুরি বা বৈতনিক শ্রম ছাড়িয়ে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে গৃহস্থালির কাজ, স্বেচ্ছাশ্রম কিংবা অবৈতনিক সেবা যা জীবনযাত্রার মান উন্নত জীবনকে সমৃদ্ধ করে।

আড়াই দশকে মানব উন্নয়নের প্রশংসনীয় অগ্রগতি এই প্রতিবেদন তুলে ধরেছে। আজকে মানুষ বেশিদিন বাঁচছে, আগের চেয়ে বেশি শিশু স্কুল যায় এবং বেশি মানুষ সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধা পাচ্ছে। মাথাপিছু আয় বেড়েছে, কমেছে দারিদ্র্য এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়েছে। প্রযুক্তি বিপ্লবের কারণে দেশে দেশে যোগাযোগ বেড়েছে। এই অর্জনের পেছনে রয়েছে শ্রম যা মানুষের সক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। উপযুক্ত শ্রম শুধু আত্মমর্যাদাবোধই দেয়না, মানুষকে সামাজিকভাবে অংশগ্রহণ করতেও উৎসাহিত করে।

তবে দারিদ্র্য এবং বৈষম্য থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই পরিবেশ বা সংঘাত এবং অস্থিতিশীলতার মতো সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। উপযুক্ত শ্রমের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো বাধার সৃষ্টি করে, যার কারণে মানুষের সক্ষমতা অনেকাংশেই অব্যবহৃত রয়ে যায়। এই সমস্যাটি যুবক, নারী, প্রতিবন্ধি এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই প্রতিবেদনের বক্তব্য হলো উপযুক্ত উপায়ে এবং সহায়ক নীতিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে সবার সক্ষমতা কাজে লাগাতে পারলে মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

এই প্রতিবেদন স্পষ্ট করেছে যে শ্রমের সাথে মানব উন্নয়নের স্বয়ংক্রিয় যোগ নেই। শ্রমের মান এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৈষম্য এবং সহিংসতা শ্রমের সাথে মানব উন্নয়নের ইতিবাচক সম্পর্ক রোহিত করে। কিছু শ্রম মানব উন্নয়নের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর যেমন শিশুশ্রম, বাধ্যতামূলক শ্রম এবং পাচার হওয়া মজুরদের শ্রম। এগুলো মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘনও বটে। অনেক ক্ষেত্রে বিপজ্জনক কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকরা অত্যাচার, নিরাপত্তাহীনতার হুমকির মধ্যে থাকে এবং কখনো কখনো তারা মানুষ হিসাবে তাদের স্বাতন্ত্র হারাবার শংকায় থাকে।

এসব বিষয়গুলো ক্রমশ গুরুত্ববহ হয়ে উঠছে কারণ বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তি বিপ্লবের কারণে বিশ্ব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের কারণে কারো লাভ হলেও কারো কারো জন্যে ক্ষতিও বয়ে এনেছে। প্রযুক্তি বিপ্লব যেমন সুযোগ তৈরি করেছে তেমনি সমস্যারও সৃষ্টি করেছে। যেমন অনিয়মিত ও স্বল্পমেয়াদী কাজ যার দরুন শ্রমিকদের সক্ষমতা কম বেশি হবার কারণে কেউ বঞ্চিত হচ্ছে, কেউ বেশি সুযোগ পাচ্ছে।

নারীরা বৈতনিক এবং অবৈতনিক শ্রমের ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত তা এই প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। চাকুরিক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি পুরুষদের তুলনায় কম, তাদের পারিশ্রমিক কম, তারা বেশি বেশি চাকুরি হারায় এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে নারীদের কম দেখা যায়। অবৈতনিক কাজের মধ্যে নারীরাই ঘরকন্না কিংবা সেবা দেয়ার কাজগুলো বেশি করে থাকে।

এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুস্থ মানব উন্নয়নের মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়নের জন্যে উপযুক্ত শ্রমই উত্তম নিয়ামক। এই ধরনের শ্রম ভবিষ্যতের ক্ষতি না করে বর্তমান প্রজন্মের সুযোগ বাড়িয়ে থাকে।

প্রতিবেদনটির বক্তব্য হলো- শ্রমের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন এগিয়ে নিতে প্রয়োজন কিছু সুস্পষ্ট কৌশল এবং নীতির; যাকে মোটা দাগে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় - কর্মসংস্থান তৈরি, শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং বিশেষ লক্ষ্যে কিছু কর্মকাণ্ড চালু করা। প্রথম হলো পরিবর্তনশীল শ্রমজগতের সুযোগ কাজে লাগিয়ে জাতীয়ভাবে কর্মসংস্থান তৈরি করা। আরেকটি ভাগ হলো সামাজিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে শ্রমিকদের অধিকার এবং সুবিধা নিশ্চিত করা। বিশেষ জনগোষ্ঠির বঞ্চনা রোধ করতে এবং বৈতনিক বা অবৈতনিক শ্রমের বৈষম্যের প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ড। উপযুক্ত শ্রম, বৈশ্বিক সমঝোতা এবং সামাজিক লেনদেন-এর বিষয়টি নতুন করে সাজানো।

জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনের পরই প্রকাশিত এই প্রতিবেদনটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বিশেষ করে ৮ নম্বর লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে যেখানে বলা হয়েছে, সবার জন্যে কর্মসংস্থান, উপযুক্ত শ্রম এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এগিয়ে নেয়া।

এই প্রেক্ষিতে শ্রম জগতের পরিবর্তন সুগভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে। শ্রম এবং মানব উন্নয়নের সম্পর্ক দৃঢ় করতে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। ২৫ বছর ধরে প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ধারণা ও সূচকগুলো বহু বিতর্ক, আলোচনা এবং সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। আমার প্রত্যাশা এ বছরের প্রতিবেদনটিও সেই ধারা বজায় রাখবে এবং মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উপায় ও কৌশল বিষয়ে নতুন আলোচনার ঝড় তুলবে।

হেলেন ক্লার্ক

প্রশাসক

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি

কৃতজ্ঞতা

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন-২০১৫ ইউএনডিপি-র মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অফিসের (এইচডিআরও) তৈরি। এই প্রতিবেদনের প্রস্তাবনা, বিশ্লেষণ বা সুপারিশমালা সবই এইচডিআরও-র এবং কোনোভাবেই ইউএনডিপি বা তার নির্বাহি বোর্ড-এর ওপর এর দায়িত্ব বর্তাবে না। জাতিসংঘের সাধারণ সভা আনুষ্ঠানিকভাবে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন-কে "স্বতন্ত্র বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন" হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে যা বিশ্বব্যাপি মানব বিকাশের সচেতনতা বাড়ানোর জন্যে একটি উপযুক্ত মাধ্যম।

এই প্রতিবেদন তৈরিতে যেমন বহু গুণীজনের অবদান রয়েছে তেমনি রয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠানের অবদান। বিশেষ করে বেনিনো এস আকিনো ৩য় (ফিলিপিনো রাষ্ট্রপতি), লেইমা গবোয়ি (২০১১-র শান্তির নোবেল বিজয়ী), রোজা ওতুনবায়েভা (প্রাক্তন কিরগিজ রাষ্ট্রপতি), নোরা পাডিলা (২০১৩-র গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রাইজ বিজয়ী), ওরহান পামুক (২০০৫-এর সাহিত্য নোবেল বিজয়ী), রবার্ট রাইখ (যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমমন্ত্রী), কৈলাশ সত্যার্থী (২০১৪-এর নোবেল শান্তি পুরষ্কার বিজয়ী) এবং মইত্রিপাল সিরিসেনার (শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি) অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া আরো যাঁদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁরা হলেন- আনতোনিয়ো অ্যান্দ্রোনি, মারিসিও আতজেনি, ফ্রেড ব্লক, ডেভিড ব্লুম, জ্যাক শার্মেস, মার্থা চেন, ডায়ান কয়েল, ক্রিস্টোফার ক্র্যামার, পিটার এভানস, ন্যান্সি ফোল্বার, ম্যারিনা গোর্বিস, কেনেথ হার্টজেন, রলফ এরিক ফান ডের হ্যোফেন, রিজওয়ানুল ইসলাম, প্যাট্রিক কাবান্ডা, ক্লডিও মন্টেনেগ্রো, নামীরা নুজহাত, ড্যানি রড্রিক, জিল রুবারি, ম্যালকম সইয়ার, ফ্রান্সিস স্টুয়ার্ট, মিগেল জেকেলি ও লানিয়াং জাং।

প্রতিবেদন প্রস্তুতিকালে প্রাসঙ্গিক এবং সংশ্লিষ্ট বিষজ্ঞদের সাথে আলোচনা বাঞ্ছনীয়। বৈঠকী আড্ডাচ্ছলে প্রথম ধাপের আলোচনা থেকে শুরু করে পূর্বনির্ধারিত উপদেষ্টা প্যানেল-এর সাথে আলোচনাও করা হয়েছে নিয়ম মেনে। তাঁরা আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন- অমর্ত্য সেন, সুধীর আনন্দ, এমি আরমেনিয়া, মার্থা চেন, মিণোঁ ডাফি, পিটার এভানস, ন্যানসি ফোলবার, গ্যারি জেরেফি, এনরিকো জোভান্নি, ম্যারিনা গর্বিস, জেমস হাইন্টস, ইয়েনস লেরচে, হোসে আনতোনিয়ো ওকাম্পো, সামির রাদওয়ান, আকিহিকো তানাকা, লেস্টার সালামন, ফ্রান্সিস স্টুয়ার্ট ও রুয়ান জংজে।

প্রতিবেদনের বিভিন্ন সূচি ও ছক তৈরিতে পরিসংখ্যান বিষয়ক উপদেষ্টাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। ওয়াসমালিয়া বিভার, মারটিন ডুরান্ড, হাইশান ফু, পাস্কুয়াল গেরস্টেনফেল্ড, ইফেইনওয়া ইসিকোয়ে, ইয়েমি কেল, রাফায়েল ডিয়েজ দে মেদিনা, ফিওনা রবার্টসন ও মিকায়েলা সাইসানা। এই প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান বিষয়ক বিভিন্ন বিশ্লেষণ ও জটিলতা সহজীকরণে সাহায্য করেছে আরো কিছু বিশেষজ্ঞ মতামত। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- জিসেলা রোবলস আগিলার, সাবিনা আলকিরে, জাক শার্ম, কেনেথ হারটজেন, ক্লাউদিয়ো মন্টেনেগ্রো এবং ইয়াংইয়াং শেন।

প্রতিবেদনটি বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান দপ্তরের কর্মকর্তাদের পরামর্শ থেকেও উপকৃত হয়েছে। তাদের সাথে আলাপ করে তথ্য আরো পরিশিলিত হয়েছে। এছাড়াও আরো বহু বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ও সহযোগিতা ছিল প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে। তাদের সবার কথা এখানে বলে শেষ করা যাবেনা। কয়েকটি আলোচনার কথা উল্লেখ করতেই হয়। আকরা, বস্টন, জেনেভা ও সিঙ্গাপুর (অংশগ্রহণকারিদের নাম পাওয়া যাবে এই ঠিকানায়ঃ http://hdr.undp.org/en/2015-report/consultations).

নিউ ইয়র্ক ও জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল, জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবী ও জাতিসংঘ নারী সংস্থার সতীর্থদের মতামত, সময় এবং সহযোগিতা ছাড়া শ্রম বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হতোনা। ফ্রান্স এবং জার্মানির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তাও উল্লেখ্য।

ইউএনডিপি-র আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরের সহকর্মিদের অবদানও রয়েছে এই প্রতিবেদন তৈরির পেছনে। যাঁরা এই মূল প্রতিবেদনের পরামর্শ প্রতিবেদন তৈরিতে প্রাথমিকভাবে সহায়তা করেছেন তাঁরা হলেন- ন্যাটালি বুশ, ডগলাস ব্রোডরিক, পেদ্রো কনসিসাও, জর্জ রোনাল্ড গ্রে, শিলা মার্নি, আয়ডিল ওডুসোলা, রোমুলো পায়েস ডি সুসা, থাঙ্গাভে পালানিভেল ও ক্লডিয়া ভিনায়। এছাড়াও ছিলেন রুবি সান্ধু-রোজোন, মুরাদ ওয়াহবা ও কান্নি উইনারাজা। র‍্যান্ডি ডেভিস, মানদীপ ঢালিওয়াল, ক্যারেন ডুকেস, অ্যালবারিক কাচু, প্যাট্রিক ক্যুলীরস, ব্রায়ান লুটস, আব্দুলায়ে মার ডিয়ে ও হেদার সিম্পসন-এর মন্তব্য, উপদেশ ও পরামর্শ এই প্রতিবেদন তৈরিতে অবদান রেখেছে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

এইচডিআরও ইন্টার্ন জেনেভা ডামায়ান্টি, কিয়াংশেং হু, ঈইং সানা রিয়াজ, এলিসাবেথ শিব ও এল ওয়াং-এর নিষ্ঠা ও অবদান উল্লেখ করতে হয়। কমিউনিকেশনস ডেভলপমেন্ট ইনকরপোরেটেড-এর পেশাদার সম্পাদনা এবং প্রকাশনার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন ব্রুস রস-লার্সন, জো কাপোনিও, ক্রিস্টোফার ট্রট, ইলেন উইলসন এবং জেরি কুইন অ্যাকুরাট ডিজাইন ও ফিনিক্স ডিজাইন উল্লেখ করার দাবি রাখেন। তাদের কারণেই প্রতিবেদনটি আকর্ষণীয় এবং সহজপাঠ্য হয়েছে।

ইউএনডিপি-র কর্মাধ্যক্ষ হেলেন ক্লার্কের নেতৃত্ব এবং সহযোগিতার জন্যে এবং পুরো এইচডিআরও কর্মিবৃন্দের নিষ্ঠার জন্যে আমার কৃতজ্ঞতা রইল।

সেলিম জাহান

পরিচালক

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অফিস (এইচডিআরও), ইউএনডিপি

ইনফোগ্রাফিকঃ মানব উন্নয়নের মাত্রা

সার সংক্ষেপ

মানব উন্নয়নের জন্যে 'কর্ম'

মানব উন্নয়ন মূলত: বেছে নেয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা - অর্থনীতির সমৃদ্ধি নয় বরং মানবজীবনের সমৃদ্ধির দিকে নজর দেয়া (তথ্যচিত্র দ্রষ্টব্য)। এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রম; যা সারা পৃথিবী জুড়েই মানুষকে বিভিন্নভাবে ব্যস্তরাখে এবং তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় নিয়ে নেয়। পৃথিবীর ৭৩০ কোটি মানুষের মধ্যে ৩২০ কোটিই কোনো একটি চাকুরীতে নিযুক্ত, অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীও বিভিন্ন সেবামূলক, সৃষ্টিশীল, স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে অথবা ভবিষ্যৎ শ্রমিক হিসেবে নিজেদের প্রস্তুত করতে নিযুক্ত। কোনো কোনো শ্রম মানব উন্নয়নে ভূমিকা রাখে, কোনোটা রাখে না। কোনোটা বরং মানব উন্নয়নের ক্ষতিসাধনই করে থাকে (চিত্র ১)।

শ্রম মানুষকে জীবিকা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অর্জনে সক্ষম করে তোলে। সমতাপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানুষকে একটি সম্মানজনক ও অর্থপূর্ণ অনুভূতি দিয়ে সমাজে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতেও সাহায্য করে। শ্রম জনকল্যাণেও ভূমিকা রাখে এবং অপরের মঙ্গল চিন্তার মধ্যে দিয়ে পরিবার ও সমাজের মাঝে ঐক্য ও বন্ধন তৈরি করে। (চিত্র ১)

চিত্র ১: শ্রম মানুষকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগিয়ে দেয়

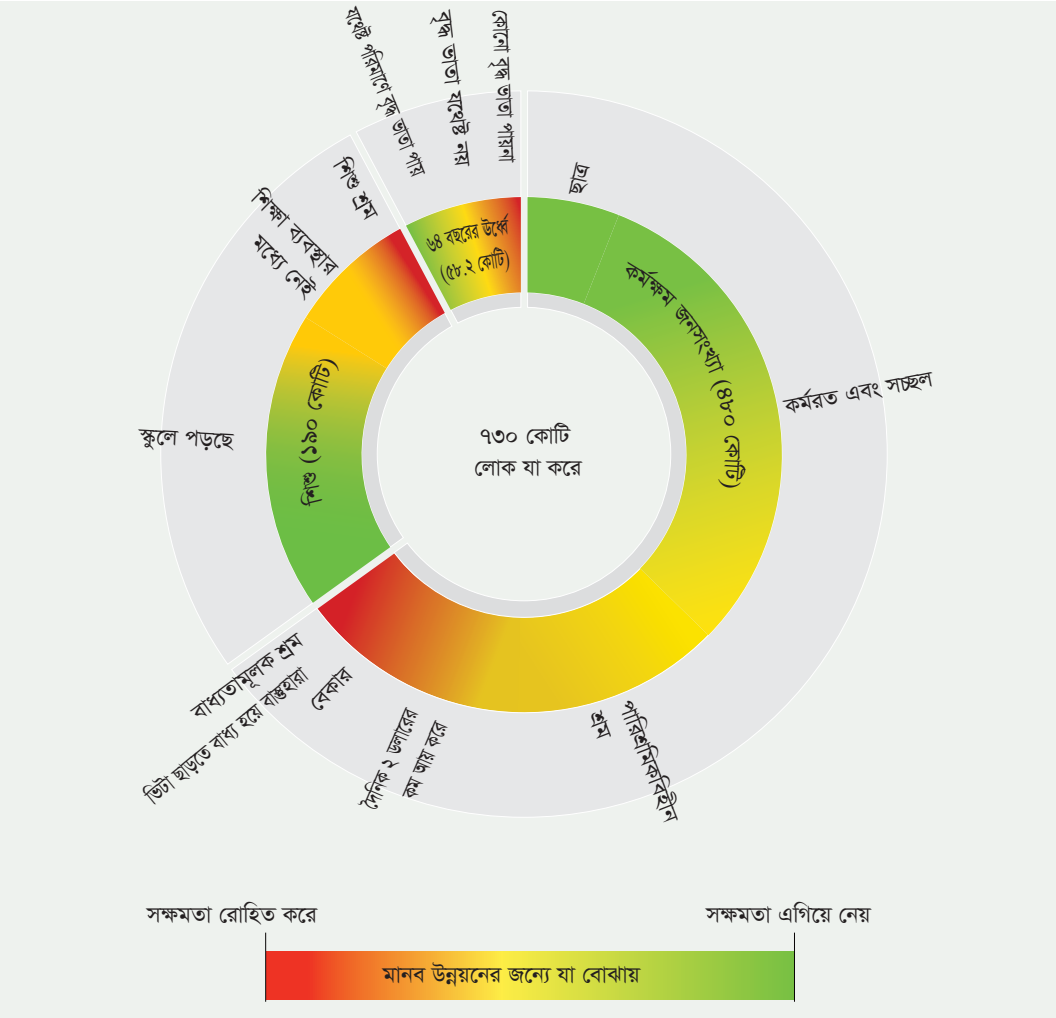

সূত্র: মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর (এইচ ডি আর ও)

শ্রম সমাজকেও শক্তিশালী করে। একসঙ্গে কাজ করার মধ্য দিয়ে শুধু বৈষয়িক মঙ্গলসাধন হয় তা-ই নয়, এর মধ্যে দিয়ে বিপুল জ্ঞান আহরণ করা হয় যা মূলত: সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাহক। আর এসব শ্রম পরিবেশ-বান্ধব হলে তার সুফল প্রজন্ম ছাড়িয়ে প্রজন্মান্তরে পৌঁছে যায়। সর্বোপরি, কর্ম মানুষের অভ্যন্তরের সম্ভাবনা, সৃষ্টিশীলতা ও আত্মশক্তিকে মুক্ত করে।

এবছরের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে মূলত: শ্রম কীভাবে মানব উন্নয়নকে আরো শক্তিশালী, দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। তবে শ্রম জগৎ দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ থেকেই যাচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে শ্রম বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, যাতে স্বেচ্ছাসেবামূলক ও সৃষ্টিশীল শ্রমও অন্তর্ভুক্ত। শুধু চাকুরীতেই আলোচনাটি সীমাবদ্ধ নয়। সেবামূলক শ্রম ও বৈতনিক চাকুরী এবং টেকসই শ্রমের নিরিখে মানব উন্নয়নের সাথে শ্রমের সংযোগটি এই প্রতিবেদনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, শ্রম ও মানব উন্নয়নের মধ্যেকার সম্পর্কটি স্বতঃস্ফূর্ত বা সহজাত নয়, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য হরণ করা হয়ে থাকে; যার কারণে বরং মানবাধিকার ও আত্মসম্মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যথাযথ নীতি ব্যতীত শ্রমের সুযোগ এবং স্বীকৃতিতেও বৈষম্য থাকে, যা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজমান অসমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করে।

মানব উন্নয়নের ধারণাটি একটি পরিমাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত - মানব উন্নয়ন সূচক বা এইচডিআই, যা মানব কল্যাণকে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, যা শুধু আয়ের ধারণার চাইতে বেশি কিছু

প্রতিবেদনের উপসংহারে রয়েছে কীভাবে যথাযথ উৎপাদনমুখী, স্বীকৃতিমূলক ও সন্তোষজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত নীতিকাঠামোর মাধ্যমে মানব উন্নয়ন আরো শক্তিশালী করা সম্ভব; শ্রমিকের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে তাদের অধিকার, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত হবে। প্রতিবেদনে একটি কর্মপরিকল্পনা সুপারিশ করা হয়েছে যার ভিত্তি হিসেবে থাকবে নতুন সামাজিক ও বৈশ্বিক চুক্তি এবং সুষ্ঠু শ্রমের দাবিমালা।

বিভিন্নজাতির প্রকৃত সম্পদ হলো তার মানুষ এবং মানব উন্নয়নের মূল লক্ষ্য তার বেছে নেয়ার সুযোগ বাড়িয়ে দেয়া। পঁচিশ বছর আগে প্রথম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে মানব উন্নয়নের ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছিল, যা ছিল খুবই সাধারণ কিন্তু সুদূরপ্রসারী এবং প্রভাব বিস্তারকারী। সমগ্র বিশ্ব দীর্ঘ সময় ধরে উন্নয়নের ধারণা হিসেবে বস্তুগত বিলাসিতার ধারণাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, এবং মানুষকে আরো প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। মানব উন্নয়নের কাঠামো, উন্নয়ন ধারণার সেই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে আরো জনমানুষ কেন্দ্রিক করেছে এবং জীবনের মান উন্নয়নের সাথে সেই কাঠামো জুড়ে দিয়েছে।

এতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে উন্নয়নের লক্ষ্য শুধু পারিশ্রমিক বৃদ্ধিই নয়; মানবাধিকার, স্বাধীনতা, সক্ষমতা ও সুযোগ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মানুষের বেছে নেয়ার সুযোগ বা সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা এবং জীবনকে আরো দীর্ঘ, স্বাস্থ্যকর ও সৃষ্টিশীল করে তোলা

বাক্স ১: মানব উন্নয়ন - সংক্ষিপ্ত ধারণা

মানব উন্নয়ন হলো মানুষের বেছে নেয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া - যাতে তারা আরো সক্ষমতা লাভ করতে পারে এবং সেই সক্ষমতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে পারে। এর লক্ষ্যও মানব উন্নয়ন। তাই এটি একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া এবং একটি ফলাফল। মানব উন্নয়নের ধারণা যে, মানব জীবনের উন্নয়নের জন্য অবশ্যই এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, তবে এটিই সব নয়।

মানব উন্নয়ন হলো মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নের প্রক্রিয়াতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, তাদের সক্ষমতা তৈরি করার মধ্যে দিয়ে জনমানুষের উন্নয়ন সাধন। এটি অন্যান্য উন্নয়নের ধারণা, যেমন- মানব সম্পদের উন্নয়ন, মৌলিক চাহিদার উন্নয়ন অথবা মানব কল্যাণের ধারণার চাইতে আরো ব্যাপক।
সূত্র: এইচডিআরও

মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের সাধারণ কিন্তু শক্তিশালী এ ধারণাকে সঙ্গী করেই গত ২৫ বছরে অন্ততঃ দুই ডজন বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ও সাত শতাধিক জাতীয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলো উন্নয়নবিষয়ক বিতর্কে অবদান রেখেছে, উন্নয়নের ফলাফল যাচাই করেছে, বিভিন্ন গবেষণার সূত্রপাত ঘটিয়েছে এবং নীতিমালাবিষয়ক বিভিন্ন সুপারিশ উপস্থাপন করেছে।

শুধু চাকুরী নয়; কর্ম মানব সমাজের অগ্রগতিতে অবদান রাখে এবং মানব উন্নয়নকে শক্তিশালী করে

মানব উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমের ধারণা নিছক চাকুরী বা কর্মসংস্থানের চাইতেও বিস্তৃত এবং গভীর। চাকুরী আয় নিশ্চিত করে এবং মর্যাদা, অংশগ্রহণ ও আর্থিক নিরাপত্তায় সহায়তা করে। তবে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, এমন অনেক কর্ম এ সংজ্ঞার আওতার বাইরে থেকে যায়। এসব কর্মের মধ্যে রয়েছে সেবামূলক কাজ, স্বেচ্ছাশ্রম এবং লেখালেখি ও শিল্পকর্মের মতো সৃষ্টিশীল ক্ষেত্র। কর্ম ও মানব উন্নয়নের মধ্যেকার সম্পর্কটি সংশ্লেষণপূর্ণ। আয় ও জীবিকা নিশ্চিত করে দারিদ্র্য সংকোচন এবং সুষম প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার মাধ্যমে কর্ম মানব উন্নয়নকে শক্তিশালী করে। স্বাস্থ্য, জ্ঞান, দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব উন্নয়ন মানবসম্পদ পুঁজি বৃদ্ধি করে এবং বেছে নেয়ার সুযোগসহ অন্যান্য সুযোগ বিস্তার করে (চিত্র ২)।

বাক্স ২: মানব উন্নয়নের পরিমাপ প্রক্রিয়া

মানব উন্নয়ন সূচক বা এইচডিআই হলো মানব উন্নয়নের তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে একটি সামগ্রিক সূচক, যার মধ্যে রয়েছে: জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের আয়ু এবং সুস্বাস্থ্যের তুলনায় গড় আয়ুর পরিমাপ; জ্ঞান অর্জনের সক্ষমতা যা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের গড় সময়কাল; এবং জাতীয় মাথাপিছু আয় অনুযায়ী উন্নত জীবনযাত্রার মান অর্জনের সক্ষমতার পরিমাপ। মানব উন্নয়ন সূচকের (এইচডিআই) সর্বোচ্চ মান ১.০।

মানব উন্নয়নকে সামগ্রিকভাবে পরিমাপের জন্য মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে আরো চারটি সামগ্রিক সূচক উপস্থাপন করা হয়েছে। অসমতা-নিরপেক্ষ এইচডিআই (আইএইচডিআই) সূচকটি অসমতার ব্যাপ্তির আলোকে এইচডিআই পরিমাপ করেছে। জেন্ডার উন্নয়ন সূচক (জিডিআই) নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে এইচডিআই'র তুলনামূলক মান বিচার করেছে। জেন্ডার অসমতা সূচক (জিআইআই) নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে আলোকপাত করেছে। এবং বহুমুখী দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে আয় বহির্ভূত বিভিন্ন উপাদানের পরিমাপ করেছে।
সূত্র: এইচডিআরও

চিত্র ২: শ্রম ও মানব উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত

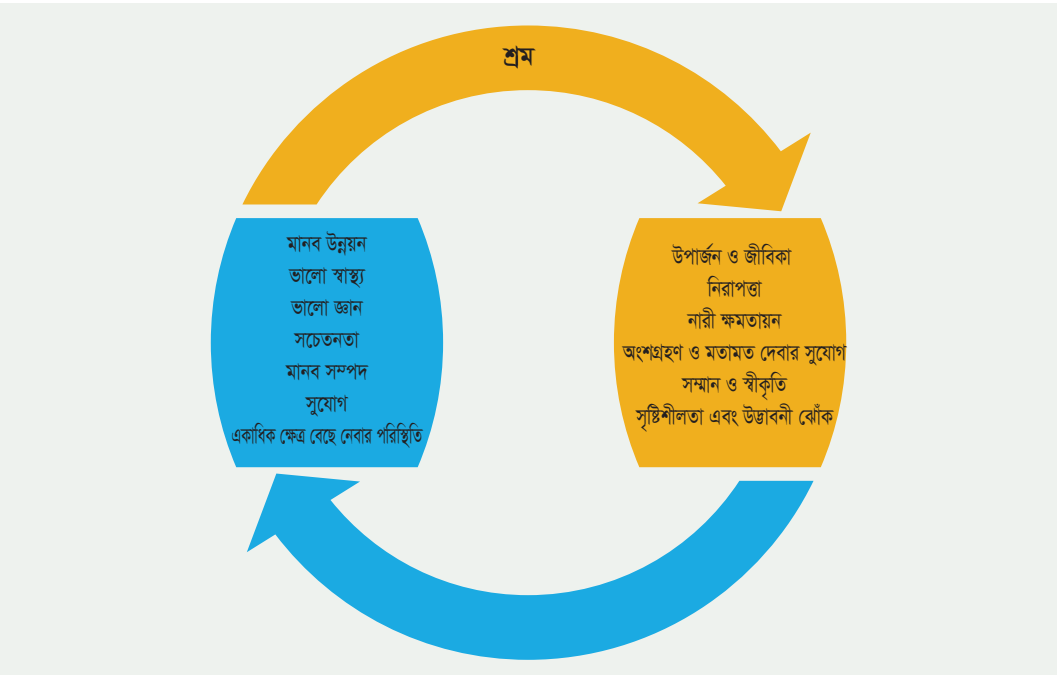

সূত্র: মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর (এইচ ডি আর ও)

১৯৯০ সাল থেকে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে বিশ্ব। বৈশ্বিক এইচডিআই মান এই সময়ের মধ্যে এক চতুর্থাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্ধেকেরও বেশি। সময়ের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে এই অগ্রগতি প্রায় স্থিতিশীল ছিল। নিম্ন মানব উন্নয়ন পরিবেশে জীবন যাপনকারী মানুষের সংখ্যা ১৯৯০ সালে ৩০০ কোটি থেকে ২০১৪ সালে ১০০ কোটিতে নেমে এসেছে।

আজকের দিনে মানুষ আরো বেশিদিন বাঁচছে, আরো বেশি সংখ্যক শিশু স্কুলে যাচ্ছে, এবং আগের চেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ সুপেয় পানি ও মৌলিক পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা পাচ্ছে। এই অগ্রগতি ক্রমবর্ধমান আয়ের সঙ্গে হাতে হাত ধরে এগোচ্ছে এবং মানব ইতিহাসের সর্বোচ্চ জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত হচ্ছে। প্রযুক্তি বিপ্লব এখন পৃথিবীর সব দেশ ও জাতি নির্বিশেষে মানুষকে সংযুক্ত করছে। এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক অগ্রগতিও এখন আগের চেয়ে বেশি মানুষকে গণতান্ত্রিক শাসনের অধীনে জীবনযাপন করতে সক্ষম করেছে। এসবই মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

১৯৯০ ও ২০১৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আয়ভিত্তিক দারিদ্র্য দুই-তৃতীয়াংশ কমে এসেছে। বিশ্বব্যাপী চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ১৯০ কোটি থেকে ৮৩ কোটি ৬০ লাখে নেমে এসেছে। শিশু মৃত্যুর হার অর্ধেকের বেশি কমেছে এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ১২ কোটি ৭০ লাখ থেকে ৬০ লাখে নেমে এসেছে। ইতোমধ্যে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৫৩০ কোটি থেকে বেড়ে ৭৩০ কোটি হয়েছে।

তবে এর মধ্যে ২৬০ কোটির বেশি মানুষ সুপেয় পানির উন্নত ও সুলভ উৎসে এবং ২১০ কোটি মানুষ উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা পেয়েছে। ৭৩০ কোটি মানুষের বিভিন্ন ধরনের শ্রমের অবদান রয়েছে এই অগ্রগতিতে। কৃষিক্ষেত্রে এবং ৫০ কোটি পারিবারিক খামারে প্রায় ১০০ কোটি মানুষের শ্রম বিশ্বের ৮০ শতাংশ খাদ্য উৎপাদন করে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের অবদান রাখছে। বিশ্বব্যাপী ৮ কোটি কর্মী স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখছে। একশ' কোটিরও বেশি কর্মী মানব উন্নয়নে অবদান রেখেছে। চীন ও ভারতে ২ কোটি ৩০ লাখ কর্মী টেকসই জলবায়ু নিশ্চিতকরণে অবদান রাখছে।

মানুষের অগ্রগতি সমান হয়নি, বঞ্চনা এখনও সুদূরপ্রসারী এবং তার সক্ষমতার অনেকটাই এখনও অকেজো পড়ে আছে।

শ্রমের সামাজিক মূল্য রয়েছে যা শ্রমিকের ব্যক্তিগত লাভের তুলনায় অনেক সুদূরপ্রসারী। ৪৫ কোটিরও বেশি উদ্যোক্তা বিভিন্ন উদ্ভাবন ও সৃজনশীল উপায়ে মানবসমাজে অবদান রাখছে। ৫ কোটি ৩০ লাখের মতো গৃহকর্মী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। শিশু পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো তাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তুলছে। বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের সেবাদানে নিয়োজিত কর্মীরা তাদের জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে উঠতে সহায়তা করছে। চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী ও সাহিত্যিকদের কর্ম মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করছে। ৯৭ কোটির বেশি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিবছর অসংখ্য পরিবার ও সমাজকে সহায়তা করছে, সামাজিক সংযোগ ও ঐক্য সৃষ্টি করছে।

মানব উন্নয়ন সব অঞ্চল, সব দেশে ও বিভিন্ন দেশের ভিতরে সব জায়গায় সমান হয়নি। ২০১৪ সালে ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে এইচডিআই মান ছিল ০.৭৪৮, অন্যদিকে আরব রাষ্ট্রগুলোতে ছিল ০.৬৮৬। অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সদস্য দেশগুলোতে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল প্রতি ১ লাখ প্রসবকালে মাত্র ২১টি, যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ছিল ১৮৩টি (পরিসংখ্যান অ্যাপেন্ডিক্স ছক ৫)।

বৈশ্বিক ভাবে নারীরা পুরুষদের চেয়ে ২৪ শতাংশ কম আয় করে এবং বাণিজ্য জগতে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপক অবস্থানগুলোর ২৫ শতাংশে কর্মরত - তবে বাণিজ্যের ৩২ শতাংশে উঁচু পদগুলোতে কোনো নারী নেই। রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় আইনসভার একক বা নিম্ন কক্ষে এখনও মাত্র ২২ শতাংশ আসন নারীদের দখলে রয়েছে।

২০১২ সালে মালয়েশিয়াতে সর্বোচ্চ ধনী ১০ শতাংশ দেশটির জাতীয় আয়ের ৩২ শতাংশ আয় করেছে, সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ আয় করেছে জাতীয় আয়ের মাত্র ২ শতাংশ। মলদোভাতে শহরে বসবাসকারীদের ৬৯ শতাংশ সুপেয় পানি পাচ্ছে, কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারীদের মধ্যে মাত্র ২৩ শতাংশ এই সুবিধা পাচ্ছে।

অসমান মানব উন্নয়নের সঙ্গে যোগ হয়েছে সুদূরপ্রসারী মানবাধিকারের বঞ্চনা। সারা বিশ্বে ৭৯ কোটি ৫০ লাখ মানুষ ক্ষুধাপীড়িত, প্রতি ৫ মিনিটে পাঁচ বছরের কম বয়সী ১১টি শিশুর মৃত্যু হচ্ছে এবং প্রতি ঘণ্টায় ৩৩ জন প্রসূতি মা মারা যাচ্ছে। প্রায় ৩ কোটি ৭০ লাখ মানুষ এইচআইভি আক্রান্ত, আরো ১ কোটি ১০ লাখ মানুষ যক্ষ্মায় আক্রান্ত।

৬৬ কোটি মানুষের খাবার পানির উৎস অনুন্নত, ২৪০ কোটি মানুষ অনুন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহার করছে এবং প্রায় ১০০ কোটি মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করছে।

বিশ্বব্যাপী ৭৮ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং ১০ কোটি ৩০ লাখ যুবা (১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী) নিরক্ষর রয়েছে। এমনকি উন্নত দেশগুলোতেও ১৬ কোটি মানুষ কার্যত নিরক্ষর। পৃথিবীব্যাপী ২৫ কোটি শিশু জীবনযাপনের মৌলিক বিষয়ের কোনো প্রশিক্ষণ পায়নি; যদিও তাদের মধ্যে ১৩ কোটি শিশু অন্তত চার বছরের স্কুলশিক্ষা শেষ করেছে।

এক ধরনের বহুমাত্রিক বঞ্চনা হলো মানব উন্নয়নে শক্তিশালী করে এ ধরনের গভীর সম্ভাবনা কর্মীদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা সম্পূর্ণ বা পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার না করা, অথবা সম্ভাবনাটির অপব্যবহার করা। আনুষ্ঠানিক বেকারত্ব পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৫ সালে ৭ কোটি ৪০ লাখ যুবাসহ ২০ কোটি ৪০ লাখ মানুষ কর্মহীন অবস্থায় ছিল। বিশ্বের প্রায় ৮৩ কোটি মানুষ কর্মরত হলেও দরিদ্র, যাদের দৈনিক আয় ২ মার্কিন ডলারেরও কম। এবং ১৫০ কোটি মানুষ সংকটপূর্ণ কর্মসংস্থানে রয়েছে, যাদের কাজের পরিবেশ যেমন বিপজ্জনক তেমনি অভাব তাদের মত প্রকাশের সুযোগ ও সামাজিক নিরাপত্তার। আগামী দিনে উদ্ভূত মানব উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনায় আনলে এই সম্ভাবনার অবমুক্তকরণ আরো জরুরী।

আয়, সম্পদ ও সুযোগের অসমতার কথা ধরা যাক। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের অধিকারে বিশ্বের সম্পদের মাত্র ৬ শতাংশ রয়েছে। ২০১৬ সালের মধ্যে এই অনুপাত ৫০ শতাংশের জন্য ১ শতাংশে গিয়ে ঠেকবে। কর্মের জগতে পারিশ্রমিক উৎপাদনের চেয়ে অনেক পিছিয়ে, আর আয়ে শ্রমিকের অংশ ক্রমেই কমছে। জনসংখ্যার স্ফীতি, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া ও সাব-সাহারা আফ্রিকা অঞ্চলে যা ঘটেছে, তা শ্রমের সুযোগ, সেবার চাহিদা এবং সেবাদানকারীর সংখ্যায় ঘাটতি এবং সামাজিক সুরক্ষার নীতিমালা গ্রহণে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে। সাম্প্রতিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, সারা বিশ্বে ১৩ কোটি

৬০ লাখ সেবাদানকারীর সংকট রয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি সঙ্কট রয়েছে ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, বয়স বেড়ে যাওয়া, তরুণ জনগোষ্ঠীর আকার বৃদ্ধি এবং নির্ভরতার অনুপাতসহ সব ক্ষেত্রেই এই প্রভাব পড়বে। ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের বেশি অর্থাৎ ৬২০ কোটি মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস শুরু করবে বলে মনে করা হচ্ছে এবং শহুরে জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অসুবিধায় পড়বে তারা।

মানুষের নিরাপত্তা বিভিন্নভাবে হুমকির মধ্যে রয়েছে। ২০১৪ সালের শেষ পর্যন্ত সারাবিশ্বে ৬ কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ও জাতীয় পর্যায়ে সহিংসতার মোট নিহতের সংখ্যা পাঁচ গুণেরও বেশি বেড়ে ৩,৩৬১ থেকে ১৭,৯৫৮টি হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা মানব উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে নিষ্ঠুর হুমকিগুলোর মধ্যে একটি। প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন শারীরিক অথবা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে।

মহামারী, স্বাস্থ্যঝুঁকি, আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকট, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার অভাবসহ বহুবিধ অভিঘাত, সংকট ও ঝুঁকির কারণে মানব উন্নয়ন পিছিয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নন-কমিউনিকেবল বা ছোঁয়াচে নয় এমন রোগে প্রতিবছর ৩ কোটি ৮০ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করছে যাদের দুই-তৃতীয়াংশই (২ কোটি ৮০ লাখ) স্বল্প ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে বসবাস করে।

ফলে এটা বর্তমানে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ (২১০ কোটি) মানুষ অতিরিক্ত ওজনের সমস্যায় ভুগছে, যাদের তিন-পঞ্চমাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বসবাস করে। পৃথিবীজুড়েই সমাজসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্রমেই জীববৈচিত্র নষ্ট হতে থাকাসহ আরো বেশি সংকটের মুখে পড়ছে।

শ্রম মানব উন্নয়নকে শক্তিশালী করতে পারে, তবে কিছু শ্রম এর ক্ষতিসাধনও করে- এ দুটির সম্পর্ক সহজাত নয়

জীববৈচিত্রই বহু দরিদ্র সমাজের জীবিকার মূল উৎস। প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ ভঙ্গুর ভূমির উপর বসবাস করছে। লাখ লাখ মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শ্রম ও মানব উন্নয়নের মধ্যেকার সম্পর্কটি সহজাত নয়। এটি শ্রম বা কাজের মান, কাজের অবস্থা, কাজের সামাজিক মূল্যসহ আরো অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। কারো কাজ আছে কি না, সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সম্পর্কিত বিষয়গুলোও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, কাজটি কি নিরাপদ? ব্যক্তি তার কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট কি না? এতে অগ্রগতির সুযোগ আছে কি না? এই নিয়োগে শ্রম-ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্যের জন্য সহায়ক কি না? নারী ও পুরুষের জন্য এতে সমান সুযোগ আছে কি না? কাজটি মর্যাদাপূর্ণ ও গর্বের অনুভূতি এনে দেয় কি না, এবং এটি অংশগ্রহণমূলক এবং এতে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ আছে কি না, এসব বিষয়ও কাজের মানের মধ্যে পড়ে।

কর্ম ও মানব উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্কটি শক্তিশালী করে তুলতে হলে টেকসই জলবায়ুর বিষয়টিও আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। কর্ম ও মানব উন্নয়নের সম্পর্কটি বেশি শক্তিশালী হয় যখন এটি ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে সামষ্টিক সামাজিক লক্ষ্যের জন্য, যেমন- দারিদ্র্য ও অসমতা দূরীকরণ, সামাজিক সংযোগ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্য কাজ করে। বিপরীতে, কর্মস্থলে বৈষম্য ও সহিংসতা থাকলে তা কাজের মূল্য কমিয়ে দেয় এবং শ্রম ও মানব উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্কটি দুর্বল করে তোলে।

কর্মের অবস্থান, পারিশ্রমিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জেন্ডার -বিষয়ক বৈষম্য এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পর্যবেক্ষণযোগ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারী বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞদের বেতন একই পদে কর্মরত পুরুষের চেয়ে ৬৬ শতাংশ কম। তবে জাতি, গোত্র, প্রতিবন্ধীত্ব ও যৌনাচারের ওপর ভিত্তি করেও বৈষম্য ঘটে থাকে। ল্যাটিন আমেরিকায় আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে পারিশ্রমিকের তারতম্য প্রায় ৩৮ শতাংশ।

বিভিন্ন ধরনের হুমকি ও শারীরিক বা মৌখিক নির্যাতনের রূপে কর্মস্থল বা পেশাগত সহিংসতাও কর্ম-মানব উন্নয়ন সম্পর্ককে দুর্বল করে। ২০০৯ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ৩ কোটি কর্মী উত্যক্তকরণ, হুমকি, ভয় দেখানো ও শারীরিক সহিংসতা রূপে কর্ম সম্পর্কিত সহিংসতার শিকার হয়। এগুলোর মধ্যে ১ কোটি ঘটে কর্মস্থলে, বাকি ২ কোটি ঘটে কর্মস্থলের বাইরে। এ সম্পর্কটি সংঘাত ও সংঘাত পরবর্তী পরিস্থিতিতেও দুর্বল হয়ে ওঠে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে শ্রম সবসময় সংজ্ঞায়িত উপকরণ-সমৃদ্ধ হয় না, বরং শুধু টিকে থাকাই মানব উন্নয়নের সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়ায়।

কিছু শ্রম কিছু পরিস্থিতিতে মানব উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অনেক মানুষ এমন সব শ্রমে নিযুক্ত যা জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বেছে নেয়ার সুযোগে তাদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। লাখ লাখ মানুষ এমন পরিবেশে কাজ করছে যা তাদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে এবং তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছে, যেমন- শিশুশ্রম, পাচার হওয়া অবৈধ শ্রমিক ও শ্রমদানে বাধ্যকৃত শ্রমিক। এছাড়াও লাখ লাখ শ্রমিক নানাবিধ ঝুঁকি নিয়েও গৃহকর্মী হিসাবে, প্রবাসে গিয়ে, যৌনব্যবসায় নিযুক্ত হয়ে এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পে কাজ করছে।

চিত্র ৩: ক্ষয়িষ্ণু ও বৈষম্যমূলক শ্রম মানব উন্নয়নকে ধূলিসাৎ করে দেয়

সূত্র: মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর (এইচ ডি আর ও)

সারা বিশ্বে এখনও ১৬ কোটি ৮০ লাখ শিশুশ্রমিক রয়েছে, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশ। এদের মধ্যে ১০ কোটি ছেলে ও ৬ কোটি ৮০ লাখ মেয়ে। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত রয়েছে।

২০১২ সালে বিশ্বজুড়ে প্রায় ২ কোটি ১০ লাখ মানুষকে জোরপূর্বক শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়েছে, শ্রমিক হিসেবে অবৈধভাবে পাচার হয়ে যৌনকাজে বা দাস হিসেবে অপব্যবহার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষকে শ্রমিক হিসেবে, এবং ৪৫ লাখ মানুষকে যৌনকাজে অপব্যবহার করা হয়েছে। এসবের শিকার পুরুষ বা ছেলেদের চেয়ে নারী বা মেয়েরা বেশি সংখ্যায় হয়েছে। জোরপূর্বক শ্রম দিতে বাধ্য করে প্রতি বছর প্রায় ১৫ হাজার কোটি মার্কিন ডলার অবৈধ মুনাফা লাভ করা হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে।

অস্ত্র ও মাদকের অবৈধ পাচারের পরেই মানব পাচারই বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে লোভনীয় অবৈধ বাণিজ্য। ২০০৭ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ১১৮টি দেশে এর শিকার ১৩৬টি জাতীয়তার মানুষ সনাক্ত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশই নারী।

অবৈধ অভিবাসীর পাচার সাম্প্রতিক সময়ে হঠাৎ করে বেড়েছে। পাচারকারীদের সংঘবদ্ধ চক্র বিভিন্ন দেশে অবৈধভাবে প্রবেশে মরিয়া অভিবাসীদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। ২০১৪ সালে ৩,৫০০ বা তার চেয়ে বেশি মানুষ লিবিয়া থেকে অবৈধ পথে ইউরোপে যাওয়ার সময় ভূ-মধ্যসাগরে নৌকাতেই মৃত্যুবরণ করে।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গৃহকর্ম লাখ লাখ মানুষের, বিশেষ করে নারীদের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সঠিক স্থানে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারলে গৃহকর্ম মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে সহায়ক হতে পারে এবং অনেক সংখ্যক পরিবারকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনতে পারে। তবে গৃহকর্মীদের, বিশেষ করে বিদেশে এই কাজে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের নির্যাতন করা

খুবই নিয়মিত বিষয়। অনেকক্ষেত্রে সঠিক আইন ও তার প্রয়োগ না থাকলে কর্মীকে নিয়োগকারী হুমকি ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিম্ন পারিশ্রমিক অথবা বিনা পারিশ্রমিকে কাজে বাধ্য করতে পারে। এমনকি তারা বেতনভুক্ত গৃহকর্মীদের অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা শ্রম দিতে বাধ্য করতে পারে, তা দৈনিক ১৮ ঘণ্টা বা তার বেশি, কোনো সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়াই হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কাজের পরিবেশ খুবই নিম্নমানের হয়, খাদ্যের পরিমাণও অনেক কম হয় এবং স্বাস্থ্যসেবার কোনও সুযোগ থাকে না। বেতনভুক্ত গৃহকর্মীরা শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকারও হতে পারে।

অনেক দেশে খনি শ্রমিকদের পেশাটি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এই পেশাতে বিশ্বের শ্রমশক্তির মাত্র ১ শতাংশ নিযুক্ত রয়েছে, তবে কর্মক্ষেত্রে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার ৮ শতাংশই এই পেশাতে ঘটে থাকে। এছাড়া আরো অনেক ক্ষত এবং কর্মক্ষমতা হরণকারী আরো অনেক রোগ, যেমন- নিউমোকোনিওসিস (ব্যাক লাং ডিজিজ) সৃষ্টি হয় খনিতে কাজের পরিবেশের কারণে।

বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব আমাদের কর্ম ও কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটাচ্ছে

মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকারিতার প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে কর্মের সংজ্ঞাও পাল্টে যাচ্ছে। কর্মের এ পরিবর্তন ঘটাচ্ছে মূলত: বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি বিপ্লব, বিশেষ করে ডিজিটাল বিপ্লব। বিশ্বায়ন বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ধ্বংসের গতিপ্রকৃতি বদলে দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এবং সৃষ্টিশীল ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মের অন্তর্জাল তৈরির মাধ্যমে বৈশ্বিক ভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে আমরা আরো নতুন ও ত্বরান্বিত প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সময়ে বসবাস করছি।

বিগত ১০ বছরে পণ্য ও সেবার বিশ্ব বাণিজ্য প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০০৫ সালে ১৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০১৪ সালে তা ২৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ডিজিটাল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রেও এই ধারা বেড়েই চলেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তিসমূহের গ্রহণ ও অনুপ্রবেশের গতি অভিভূত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর কাছে টেলিফোন পৌঁছে দিতে ৫০ বছরের বেশি সময় লেগেছিল। কিন্তু সেলফোন বা মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে সেই অবস্থানে পৌঁছাতে সময় লাগে মাত্র ১০ বছর (চিত্র -৪)। ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ এই গ্রহে ৭০০ কোটির বেশি মানুষ মোবাইল ফোন এবং ৩০০ কোটির বেশি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করবে।

চিত্র ৪: যুক্তরাষ্ট্রে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করার সময়

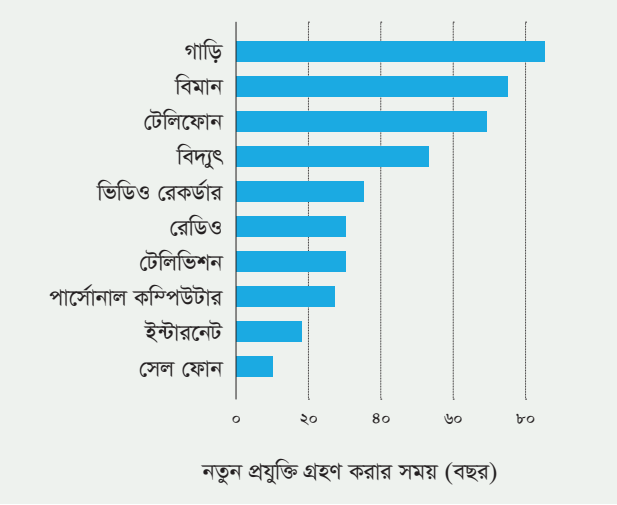

সূত্র: ডোনে ২০১৪ (গ্রহণ করা বলতে বোঝাচ্ছে জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের মধ্যে কোন একটি প্রযুক্তি চালু হওয়া)

ডিজিটাল বিপ্লবে প্রবেশের ক্ষেত্রে অঞ্চল, লিঙ্গ, বয়স ও শহর-গ্রামে অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে অসমতা রয়েছে। ২০১৫ সালে উন্নত দেশগুলোর ৮১ শতাংশ বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ ছিল, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে এ হার ছিল ৩৪ শতাংশ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ৭ শতাংশ।

কর্মী ও বাণিজ্যকে আউটসোর্সিং ও গ্লোবাল ভ্যালু চেইনের মাধ্যমে একটি বৈশ্বিক যোগাযোগে নিয়ে এসেছে বিশ্বায়ন। কোম্পানিগুলো তাদের কিছু কাজ, অথবা কেন্দ্রীয় কাজের বাইরের কাজগুলো অন্যান্য স্থানে যেখানে শ্রমসহ অন্যান্য কাঁচামালের মূল্য কম, সেসব দেশে পাঠিয়ে দেয় বা চুক্তির ভিত্তিতে করিয়ে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, অ্যাপেল ইনকর্পোরেশন সারা বিশ্বে তাদের পণ্যসমূহের নকশা, বিক্রয়, উৎপাদন ও অ্যাসেম্বলি কাজে নিযুক্ত সাড়ে ৭ লাখ কর্মীর মধ্যে মাত্র ৬৩ হাজার কর্মীকে সরাসরি নিয়োগ দিয়ে দেয়।

অনেক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এখন গ্লোবাল ভ্যালু চেইনের মাধ্যমে দেশ, এমনকি মহাদেশের সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছে। এই সমন্বয় কাঁচামাল ও পণ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে শুরু করে বিক্রয় পরবর্তী সেবা পর্যন্ত চলছে। উৎপাদন মূলত: অন্তর্বর্তী পণ্য ও সেবাসমূহকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে দেয়া, এবং পুরো প্রক্রিয়াটাকে বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উৎপাদনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে জ্ঞান। এমনকি উৎপাদিত পণ্যের মূল্যও নির্ধারণ করা হয় পণ্যবিষয়ক সমন্বিত ও ক্রমবর্ধমান জ্ঞান থেকে। ২০১২ সালে জ্ঞানভিত্তিক পণ্য, সেবা ও অর্থায়ন সম্পর্কিত বাণিজ্যের মূল্য ছিল ১৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিশ্বব্যাপী মোট পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের একটি বিশাল অংশে শ্রমঘন পণ্যের বাণিজ্যের চেয়ে ১.৩ গুণ দ্রুত গতিতে বেড়েছে।

ডিজিটাল বিপ্লব অংশীদারিত্বমূলক অর্থনীতি, ব্যবসা প্রক্রিয়ার আউটসোর্সিং (আপওয়ার্ক), শিথিল কর্মঘণ্টাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন সীমান্ত খুলে দিয়েছে। এটি সৃজনশীল কর্মের ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটিয়েছে এবং ক্ষুদ্র ও স্থানীয় উৎপাদনকারীদের ক্ষমতায়ন করেছে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি শুধু কর্মেরই রূপান্তর ঘটায়নি, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে চালিকাশক্তির ভূমিকাও পালন করছে। দূরদর্শিতার ফলে অনেক সহযোগী দল তাদের ভাবনাকে স্পর্শযোগ্য পণ্য ও সেবায় পরিণত করেছে। এর মূলে ছিল কম্পিউটার ও ইলেক্ট্রনিক্সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্ভাবন। ১৯৯০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে এ ক্ষেত্রে নতুন পেটেন্টের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ২৫ শতাংশ থেকে ৫৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে স্বেচ্ছাশ্রমের রূপও বদলে গেছে। এখন ডিজিটাল উপায়ে বা অনলাইনেও স্বেচ্ছাসেবা দেয়া সম্ভব। ২০১৪ সালে জাতিসংঘের স্বেচ্ছাসেবীদের অনলাইন স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থা ১০,৮৮৭ জন স্বেচ্ছাসেবীকে (যাদের ৬০ শতাংশ নারী) তাদের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন কর্মে কাজে লাগানোর সুযোগ করে দিয়েছে।

যেসব প্রযুক্তি কর্মের রূপ পাল্টে দেয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্লাউড প্রযুক্তি, থ্রিডি প্রিন্টিং, আধুনিক রোবট প্রযুক্তি, জ্বালানি সংরক্ষণ এবং জ্ঞানভিত্তিক কর্মের স্বয়ংক্রিয়তা, যা কিনা জ্ঞানভিত্তিক কর্মের সংস্থা ও উৎপাদনশীলতার ধারণা ইনটেলিজেন্ট সফটওয়্যার সিস্টেমের মাধ্যমে রূপান্তর করবে এবং লাখ লাখ মানুষকে ইনটেলিজেন্ট ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবহারে সক্ষম করবে।

কর্মের এই নতুন বিশ্বে কর্মীদের আরো নমনীয় ও অধিক অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া জরুরি, এবং কর্মের শর্তগুলো পুনঃপ্রশিক্ষণ, পুনঃস্থাপন ও পুনরায় আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত থাকাও জরুরি। কর্মের বিভিন্ন নতুন সুযোগ খোঁজার জন্য অধিক সময় ব্যয়েরও প্রয়োজন রয়েছে।

এই নতুন কর্মবিশ্বের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা বেশির ভাগই সহস্রাব্দান্তরের প্রজন্ম, যাদের জন্ম ১৯৮০ সালের পরবর্তী সময়ে। এই প্রজন্ম বড় হয়ে উঠেছে এমন একটা সময়ে যখন ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানবজীবনের সব ক্ষেত্রেই অনুপ্রবেশ করেছে। তারা এমন একটা সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠেছে যখন নমনীয়, অভিযোজনক্ষম ও রীতিবিরুদ্ধ কর্মই সাধারণ হিসেবে ক্রমেই বেশি গ্রহণযোগ্য।

সহস্রাব্দান্তরের প্রজন্মের অনেকেই এমন কর্ম খুঁজছে যা মুনাফা অর্জনের চেয়েও বেশি কিছু, যা তাদের জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি পরিবেশগত ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও করবে।

সামাজিক উদ্যোক্তারাও নতুন কর্মশক্তি হিসেবে উঠে আসছে। তারা মূলত: সামাজিক সমস্যা সমাধানে ব্রতী এবং অলাভজনক কোম্পানি (যেখানে মুনাফার সব অংশই পুনরায় কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে) প্রতিষ্ঠা করছে যেগুলোর মূল লক্ষ্য হলো আর্থিকভাবে টেকসই হওয়ার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সামাজিক কল্যাণ সাধন।

শ্রমের বিশ্বায়ন কারো জন্য লাভজনক, কারো জন্য ক্ষতিকর হয়েছে

আউটসোর্সিং, অ্যাসেম্বেলিং প্রভৃতি কাজ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে চলে যাওয়ায় সেখানে রপ্তানিমুখী শিল্প কল-কারখানা গড়ে উঠছে এবং এসব দেশে রপ্তানি উন্নয়ন এলাকা তৈরি করা হচ্ছে। চীন ও মেক্সিকোর মতো বৃহৎ উন্নয়নশীল দেশের পাশাপাশি কোস্টারিকা, ডোমিনিকান রিপাবলিক ও শ্রীলঙ্কার মতো ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও কর্ম সংস্থান সৃষ্টির প্রভাব বেশ বাস্তব ও ইতিবাচক। তবে এসব দেশে কর্মের মান এবং শ্রমিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের মানে বেশ তারতম্য আছে।

বিভিন্ন সেবা পণ্যের এই সীমানা পেরোনো ১৯৯০ এর দশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে শুরু করে। কোম্পানিগুলো অধিকাংশ সহায়ক সেবা মূল কেন্দ্রের বাইরে রাখায় এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান দ্রুত বাড়তে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সরাসরি কর্মসংস্থান ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ২ লাখ ৮৪ হাজার থেকে বেড়ে ২০ লাখে এসে দাঁড়ায়। ভিন্ন সময় অঞ্চলের সুবিধা নিয়ে ২৪ ঘণ্টার সেবা দেয়ার উদ্দেশ্যে রাশিয়ান ফেডারেশন, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকাতেও এক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়ছে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আউটসোর্সিং করা সব ক্ষেত্র ও সব কর্মী উপকারে আসেনি।

যদিও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আউটসোর্সিং সাধারণভাবে উপকারী বলে দৃশ্যমান হয়, তবে সেসব দেশের কর্মীদের জন্য এর কিছু নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যদিও এর দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলের বিষয়ে পরিসংখ্যানের অভাব রয়েছে, ফলে স্বল্পমেয়াদী ফলাফলের তুলনায় তা খুব পরিষ্কার নয়। তবে সেবা খাতে কর্মী ছাঁটাইয়ের সংখ্যা উৎপাদন খাতের চেয়ে বেশি।

বিদেশে আউটসোর্সিংয়ে স্বল্পমেয়াদে ছাঁটাইয়ের ঘটনা শূন্য থেকে শুরু করে ৫৫ শতাংশ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, যেসব ছাঁটাইয়ের সবগুলোই ঘটেছিল পর্তুগালে। আজকের দিনে প্রশাসন, বাণিজ্য ও আর্থিক শাখা সম্পর্কিত, এবং কম্পিউটার ও গণিত সম্পর্কিত কাজের ক্ষেত্রে সিংহভাগই আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে কোনো কাজের ২০ থেকে ২৯ শতাংশ দেশগুলোর বাইরে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তবে তার সবটুকুই বাইরে যায় না।

শিক্ষার স্তর এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোগত অগ্রগতি হওয়ায় বিভিন্ন দেশে এই সম্ভাব্য কাজগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই মধ্যম ও উচ্চ মানের দক্ষ কর্মীদের দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে সম্পন্ন করানো সম্ভব। ফলে আউটসোর্সিংয়ের কাজ গ্রহণকারী দেশগুলোতে নতুন কর্মসংস্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিশাল সুবিধা পাওয়া গেলেও ছাঁটাইকৃত কর্মীদের জন্য চরম প্রতিযোগিতামূলক এই শ্রমবাজারে নতুন কর্মসংস্থান খুঁজে পেতে আরো নতুন দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে। এই ভারসাম্য রক্ষার জন্য এমন সব প্রকল্পের প্রয়োজন যেগুলো কর্মীদের নতুন কাজ খুঁজে পেতে সহায়তা দিবে, দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং মূল আয় উপার্জনে সাহায্য করবে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর কর্মীদের নতুন কর্মসংস্থানে প্রবেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমন্বিতকরণ নারীদের জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে (যেগুলোর বেশিরভাগই পোশাক শিল্পে) এবং শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হারে পরিবর্তন এনেছে। ২০১৩ সালে বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে যুক্ত ছিল ৪৫ কোটি ৩০ লাখ কর্মী (১৯৯৫ সালে ছিল ২৯ কোটি ৬০ লাখ), এদের মধ্যে ১৯ কোটি কর্মীই ছিল নারী। তবে এই সমন্বয়করণ শ্রমের মান এবং কর্মী নিজের মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে কি না, সে সম্পর্কে খুব বেশি ধারণা দেয় না। শ্রমের নিরাপত্তা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগের বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে।

বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থা রাষ্ট্র ও শিল্পের মধ্যে লাভকারী ও ক্ষতিগ্রস্ত সৃষ্টি করে। বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলের অবাধ প্রকৃতি শ্রমের নিরাপত্তা হ্রাস করে এবং সরকার ও ক্ষুদ্র নিয়োগকারীদের ব্যয় সংকোচনে বাধ্য করে। এর ফলে কর্মীদের, বিশেষ করে কম দক্ষ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক ও কর্মস্থলের পরিবেশের ওপর চাপ পড়ে। উন্নয়নশীল দেশগুলো এই বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলের নিম্ন মূল্য সংযোজন প্রান্তে আটকে যাওয়ার চাপের মুখেও পড়ে, যার ফলে শ্রমের সুযোগসহ দক্ষতা বৃদ্ধি ও নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতির সুযোগও সীমিত হয়ে যেতে পারে।

ভবিষ্যতের ডিজিটাল বিপ্লবে অবস্থান দখল করা সুযোগ বা ভাগ্যের বিষয় নয়- এটা দক্ষতা ও দূরদৃষ্টির বিষয়

বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলের রূপান্তর উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশগুলোতেই শ্রমের ক্ষেত্রে নতুন সব জটিলতার উদ্ভব ঘটিয়েছে। এই শৃঙ্খলের বাইরে থেকে শ্রম দেয়ার তুলনায় এর ভেতরে থেকে শ্রম দিয়ে কর্মীরা কতটুকু বেশি লাভ করছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এই শৃঙ্খলের ভেতরে থাকা কর্মে উচ্চ হারে উৎপাদনশীলতার বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া গেছে, কিন্তু এর ভেতরে ও বাইরে থাকা কর্মীদের পারিশ্রমিকের হার একই রয়েছে, যা উৎপাদনশীলতার উচ্চ হার কর্মী ও পুঁজির মধ্যে কীরূপে বণ্টন হচ্ছে সে বিষয়ে প্রশ্নের উদ্ভব করেছে। বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে সঞ্চারিত বাজারের চাপ পুরোটাই কর্মীদের ওপর গিয়ে পড়ে, সেটা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার ফলে পারিশ্রমিক সংকোচনের মাধ্যমে, অথবা অনানুষ্ঠানিক চুক্তির নিরাপত্তাহীনতার রূপে, অথবা অধিকার বঞ্চিত শ্রমশক্তির ওপর বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার কারণে ঘটে থাকে।

এক্ষেত্রে মিশ্র শর্ত চুক্তিভিত্তিক বা অনিয়মিত কর্মী, স্বাধীন ঠিকাদার, প্রকল্পভিত্তিক কর্মী ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ দিয়ে উৎপাদনে স্থিতি আনা হয় এবং ব্যয় ব্যবস্থাপনা করা হয়। মূল্য শৃঙ্খলের ভেতরে থাকলে তা কিছু কর্মীর জন্য নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে, তবে অন্য কর্মীদের জন্য শ্রম দ্বৈতবাদ রূপে কর্মসংস্থানকে আরো নিরাপত্তাহীন করে তোলে।

মানুষ যে ধরনের কাজ করে থাকে, এবং যে প্রক্রিয়ায় কাজ সম্পাদন করে থাকে, তা নতুন প্রযুক্তির দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তন নতুন নয়, তবে শ্রম ও মানব উন্নয়নের মধ্যেকার সম্পর্কটিকে নতুন আকার দিচ্ছে এ পরিবর্তন, একইসঙ্গে গণমানুষের জন্য ইতিবাচক প্রভাবসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানকেও পাল্টে দিচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তার ও অনুপ্রবেশ সব স্থানেই শ্রমের জগতকে পাল্টে দিচ্ছে, তবে এর প্রভাব দেশে দেশে ভিন্ন। কিছু প্রযুক্তিগত বদল অতি যুগান্তকারী, যেমন- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য হাতে বহনযোগ্য ডিভাইস বা যন্ত্রহমূহ। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে এবং মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে সম্পদ বিনিয়োগের জন্য পরিবর্তনশীল উৎপাদন, শ্রম নিয়োগ পদ্ধতি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ভিন্ন ধরনের ব্যবহার করে থাকে। প্রতিটি দেশের শ্রমবাজার, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম ও পারিশ্রমিকবিহীন শ্রমের অনুপাত এবং কর্মস্থলের পূর্বনির্ধারিত ধরন ভিন্ন হয়ে থাকে। ফলে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রভাবও একেকটি দেশে একেক রকম হয়।

ডিজিটাল বিপ্লব যদিও উচ্চপ্রযুক্তি সম্পর্কিত শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত, তবে এটি কৃষি থেকে শুরু করে রাস্তার ফেরিওয়ালা পর্যন্ত সব ধরনের অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রমকেও প্রভাবিত করছে। এগুলোর মধ্যে কিছু সরাসরি মোবাইল ফোন নামক ডীভাইসটির সঙ্গে জড়িত। ইথিওপিয়াতে কৃষকরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কফি বীজের মূল্য জেনে নেয়। সৌদি আরবে কৃষকরা তারহীন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রায় দুর্লভ সেচের পানি বিতরণ করে গম উৎপাদন করে।

বাংলাদেশের কিছু গ্রামে নারী উদ্যোক্তারা নিজের মোবাইল ফোনটি অর্থের বিনিময়ে প্রতিবেশীদের ব্যবহার করতে দেয়। মোবাইল ফোন এখন ভয়েস কল, এসএমএস ও অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে শ্রমের অনেক ক্ষেত্রে সহযোগী হিসেবে কাজ করে। এর আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক, বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক সুফল রয়েছে আরো অনেক- কায়রোর খাবারের দোকানের মালিক থেকে শুরু করে সেনেগালের রাস্তার জমাদার হয়ে লন্ডনের স্বেচ্ছাসেবী পর্যন্ত সবাই এর সুফলভোগী।

ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন জনমানুষকে তাদের সৃজনশীলতা ও মৌলিকত্বকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন করেছে। মোবাইলের মাধ্যমে অনেক কিছু সম্ভব, বিশেষ করে নারী ও পুরুষের অসমতা, গ্রাম ও শহর এলাকার অসমতা দূরীকরণে। যদি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবস্থা উন্নত দেশগুলোর সমান হতো তাহলে সম্ভাব্য আরো ১৪ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আরো ২.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার জিডিপি আয় করা সম্ভব হতো বলে মনে করা হয়, যেসব কাজের ৪.৪ কোটি দক্ষিণ আফ্রিকা, এবং ৬.৫ কোটি ভারতে হতো। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদনশীলতা ২৫ শতাংশ বাড়ানো যেত।

ডিজিটাল অর্থনীতি বহু নারীকে এমন কাজে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে যেখানে তারা নিজেদের সৃজনশীলতা ও সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারছে। ২০১৩ সালে ১৩০ কোটি নারী ইন্টারনেট ব্যবহার করছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই ই-বাণিজ্যে উদ্যোক্তা হিসেবে অংশ নিচ্ছেন, কেউ কেউ ক্রাউডওয়ার্কিং ও ই-কমার্সের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। তবে এই নতুন কর্মবিশ্ব সবসময়ই দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, যা নারী কর্মীদের মধ্যে কম দেখা যায়।

বয়স্ক কর্মীদের জন্যও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে, যাদের বেশির ভাগই তাদের কাজ ভালোবাসেন বলে কাজ ছাড়েন না, অথবা কাজ ছেড়ে অবসরে যাওয়ার সুযোগটি নেই তাদের হাতে। ভিন্ন শ্রমবাজারের বয়স্ক ও কমবয়সী কর্মীরা রয়েছেন (কারণ তাদের জন্য কোনো সরাসরি বিকল্প নেই), এবং বয়স্ক কর্মীদের কাজ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে বলে তরুণরা উদ্বেগে আক্রান্ত হবে বিষয়টা মোটেই এমন নয়।

তবে এখনও এসব ক্ষেত্রে ঝুঁকি এবং এমনসব প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা হয়তো এমন একটি সংশ্লেষ বিন্দুতে আছি যার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে। প্রযুক্তি বিপ্লব এনে দিয়েছে দক্ষতাভিত্তিক প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। ধারণা করা হচ্ছে, নতুন প্রযুক্তিসমূহের মোট প্রভাব স্বল্পদক্ষ কর্মীর প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দিচ্ছে, অপরদিকে উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর চাহিদা বাড়িয়ে দিচ্ছে। সংজ্ঞাগত ভাবে এ ধরনের পরিবর্তন গণমানুষের জন্য উচ্চ মানবসম্পদের পুঁজি এবং সমাবর্তনযোগ্য শ্রমের সুযোগ এনে দেয়।

শীর্ষ স্থানে উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীদের জন্য ভালো কর্মসংস্থান থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, অটোমোবাইল শিল্পে লাভবান হবে প্রকৌশলীরা যারা নতুন বাহনের নকশা এবং এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে। নিচের দিকের অবস্থানে স্বল্পদক্ষ, স্বল্প উৎপাদনশীল, স্বল্প আয়ের পেশাগুলোও থাকবে, যেমন- পরিচ্ছন্নতা কর্মী। তবে মধ্যবর্তী পর্যায়ের পেশাগুলোতে ক্রমেই ছাঁটাইয়ের প্রকোপ বাড়বে, এবং এ ধরনের স্বল্প দক্ষতার, রুটিন মাফিক কাজের কর্মীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়বে।

চিত্র ৫: খুব সহজে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বা যন্ত্র দিয়ে যেসব কাজ চালানো যাবে এবং যন্ত্র দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ এমন কয়েকটি ক্ষেত্র

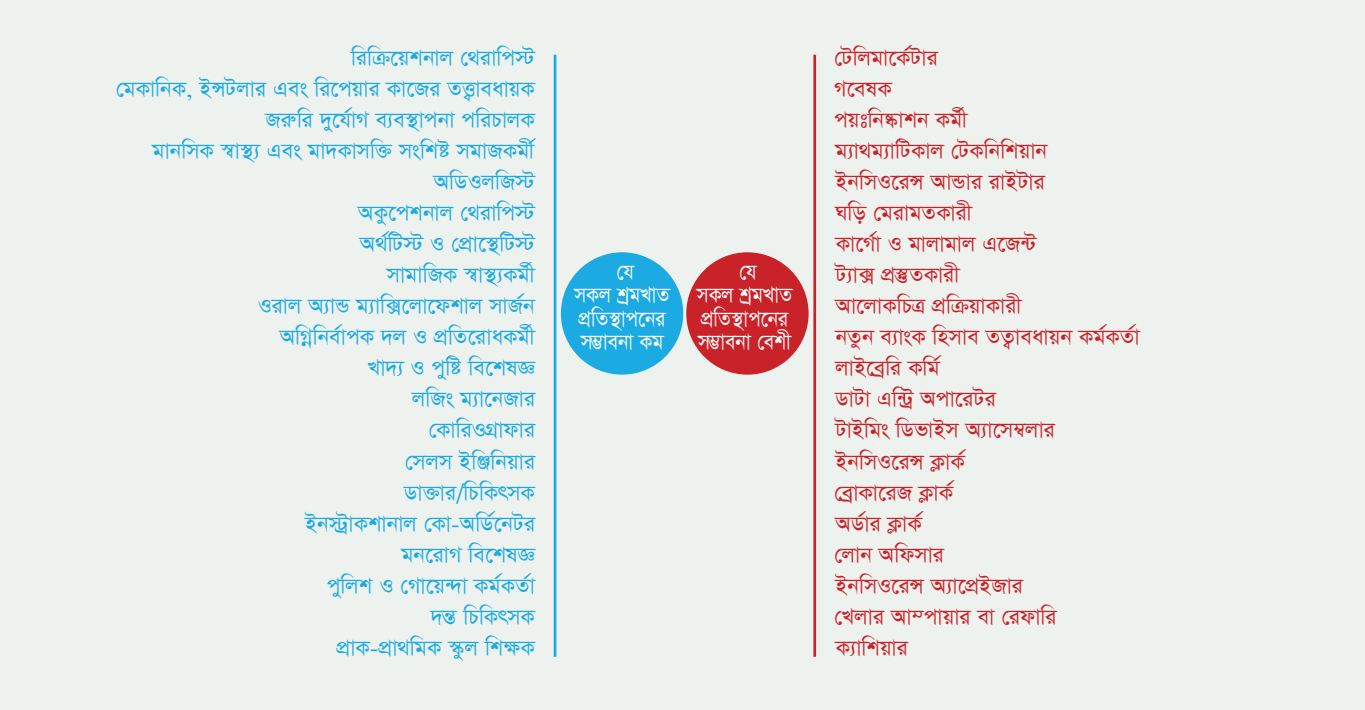

সূত্র: ফ্রে ও অসবোর্ন, ২০১৩ (ওপরের শ্রমখাতগুলো মার্কিন শ্রম অধিদপ্তরের বিন্যাস অনুসরণ করে তৈরি)

কিছু জটিল জ্ঞানভিত্তিক পেশা এমনকি যুক্তিপূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও সক্ষমতার বাইরে থেকে যাবে। এ কারণে কিছু শিল্প কর্মীস্বল্পতার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। ফলে অত্যন্ত মেধাবীদের খোঁজে থাকা উচ্চ পারিশ্রমিক দিতে ইচ্ছুক কোম্পানিগুলো বৈশ্বিক বাজারের দিকে ঝুঁকতে পারে। এছাড়াও কর্মীরা জাতীয়ভাবে সমাবর্তিত হলেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ মর্যাদা পাচ্ছে এখন, যেখানে স্বল্পদক্ষ কর্মীরা আসছে জাতীয় শ্রমবাজার থেকে এবং উচ্চ দক্ষতাসম্পন্নরা আসছে বৈশ্বিক বাজার থেকে।

এখন সময় এসেছে বিশেষ দক্ষতা ও সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মী হওয়ার, কারণ মানুষ এখন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সৃষ্টি করতে পারে, এবং সৃষ্টি দ্বারা মূল্য আদায় করতে পারে। তবে সাধারণ দক্ষতা ও সক্ষমতাসম্পন্ন কর্মী হওয়ার জন্য এর চেয়ে খারাপ সময় আর হতে পারে না, কারণ কম্পিউটার, রোবট ও অন্যান্য ডিজিটাল প্রযুক্তি এখন এসব দক্ষতা ও সক্ষমতার কাজগুলো অসাধারণ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে পারছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির এক আরোপিত প্রতিজ্ঞা ছিল যে এটি শ্রমঘন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে, যা উচ্চ পারিশ্রমিকে পরিণত হবে। দুটির কোনটিই অর্জন হয়নি: উৎপাদনশীলতা আশানুরূপ হারে বৃদ্ধি পায়নি এবং খুবই কম সংখ্যক মানুষের আয় উচ্চ আয়ে পরিণত হয়েছে। অনেক অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধির মধ্যেকার এই পার্থক্য বরং আরো বেড়েছে, যেমন- নেদারল্যান্ডসে। এবং এর ফলে পরিস্থিতি এখন আরো সংকটপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ সিংহভাগ কর্মীর আসল পারিশ্রমিক স্থিতাবস্থায় আবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু উচ্চ আয়ের পেশাজীবীদের আয় অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রযুক্তি বিপ্লবের সঙ্গেই আরো বেড়েছে ক্রমবর্ধমান অসমতা। কর্মীরা মূলত পাচ্ছে তাদের মোট আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ। এমনকি অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানুষ যারা উৎপাদনশীল শ্রম দিতে সক্ষম তারাও তুল্য আয়, স্থিতিশীলতা ও সামাজিক স্বীকৃতি নাও পেতে পারে।

আয়ে কর্মীর অংশীদারিত্ব ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকার বিষয়টি গড় প্রবৃদ্ধির ধীরগতির একটা অংশ হিসেবে দেখা যায়: যেহেতু উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমের আয়ে (এবং পুঁজিতে) কর্মীদের অংশীদারিত্ব ক্রমেই বাড়ছে, এই আয়ে অন্যান্য কর্মীদের অংশ তাই ক্রমেই কমছে। উচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত কর্মীদের পেশাগত ক্ষতিপূরণ দ্রুতগতিতে বেড়ে যাওয়ার ফলে উপকৃত হয়েছে আসলে খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ, হয়তো শীর্ষ পর্যায়ের ১০ শতাংশ, ১ শতাংশ বা ০.১ শতাংশ। ২০১৪ সালে বৈশ্বিকভাবে অভিজাত, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশ জনগোষ্ঠীর কাছে প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি গড়ে ২ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার মূল্যের সম্পদ ছিল। কর্মী, নিয়োগকারী ও নীতি নির্ধারকেরা কি উদীয়মান শ্রমবিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলো নিতে প্রস্তুত? এ এমন এক বিশ্ব যেখানে কিছু নির্দিষ্ট প্রযুক্তি দ্রুত সেকেলে অপ্রচলিত হয়ে পড়ে, এবং নীতি ও প্রশাসন সময়োপযোগী না হলে কার্যকারিতা থাকে না।

পারিশ্রমিকসহ ও পারিশ্রমিকবিহীন উভয় কর্মের ক্ষেত্রেই ভারসাম্যহীনতা নারীদের অসুবিধাজনক অবস্থানে ঠেলে দেয়

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ও পারিশ্রমিকবিহীন শ্রমের দুই পৃথক জগতে স্পষ্টভাবে জেন্ডার অসমতা জারি রয়েছে, যার মূলে রয়েছে স্থানীয় সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিকভাবে মানুষের জেন্ডারভিত্তিক ভূমিকা। পরিবারের সবার খাবার তৈরি, বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা, জ্বালানির জন্য কাঠ ও পানি সংগ্রহ করা প্রভৃতি গৃহস্থালির কাজ এবং পরিবারের শিশুদের লালন-পালন, অসুস্থ ও বয়স্কদের দেখাশোনা করা, এসবই স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে সেবামূলক শ্রমের মধ্যে পড়ে। প্রতিটি অঞ্চলের বেশিরভাগ দেশেই নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি শ্রম দিয়ে থাকেন। সারা বিশ্বে সম্ভাব্য মোট কাজের ৫২ শতাংশ নারীরা করে থাকেন, ৪৮ শতাংশ করেন পুরুষরা।

তবে শ্রমের বোঝা অর্ধেকের বেশি নারীরা বহন করলেও পারিশ্রমিকসহ ও পারিশ্রমিকবিহীন উভয় শ্রমের ক্ষেত্রেই নারীরা অসুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন। উভয় শ্রমের ক্ষেত্রেই কাজের কাঠামো তাদের এই অসুবিধার মধ্যে ঠেলে দেয়।

২০১৫ সালে বৈশ্বিক শ্রমশক্তিতে পুরুষদের অংশগ্রহণ ছিল ৭৭ শতাংশ, কিন্তু নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ৫০ শতাংশ। এ বছর সারা বিশ্বে কর্মক্ষম (১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী) পুরুষ জনশক্তির ৭২ শতাংশ কর্মস্থলে নিয়োগ পেয়েছে। কর্মক্ষম নারীদের ক্ষেত্রে এ হার মাত্র ৪৭ শতাংশ। শ্রমশক্তি ও নিয়োগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণসহ গৃহে শ্রমের অসম বণ্টনের কারণে ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমের মধ্যে ৫৯ শতাংশ বাড়ির বাইরের কর্মসংস্থান, যাতে পুরুষদের অংশগ্রহণ ৩৮ শতাংশ যা নারীদের ২১ শতাংশ অংশগ্রহণের প্রায় দ্বিগুণ। তবে পারিশ্রমিকবিহীন কাজের ক্ষেত্রে চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত, যার সিংহভাগই বাড়ির ভেতরের এবং সেবাদানমূলক শ্রম। পারিশ্রমিকবিহীন ৪১ শতাংশ কাজের তিন চতুর্থাংশই করেন নারীরা। এসব কাজে নারীদের অংশগ্রহণ ৩১ শতাংশ, আর পুরুষদের অংশগ্রহণ ১০ শতাংশ।

এই অসমতার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমের জগত আয়ত্ত করে আছেন এবং নারীরা পারিশ্রমিকবিহীন কাজের জগত। গৃহের অভ্যন্তরের পারিশ্রমিকবিহীন কাজগুলো সমাজের কার্যক্রম চালিয়ে নেয়া এবং মানব কল্যাণের জন্য অপরিহার্য, তবে এগুলো যখন নির্বিশেষে নারীদের ওপর পড়ে তখন তার অন্যান্য কর্মসংস্থান এবং সামাজিক ও অবসর সময়ের কার্যক্রম বেছে নেয়ার সুযোগ সীমিত করে তোলে, যা হয়তো তার জন্য আরো সন্তোষজনক হতো।

এমনকি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমের ক্ষেত্রেও নারীরা অসুবিধা ও বৈষম্যের মুখোমুখি হয়। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ কম। নারীরা এসব পদগুলোর মাত্র ২২ শতাংশ দখল করে আছেন। এবং আঞ্চলিক স্তরে ব্যতিক্রম ছাড়া বিশ্ববাণিজ্যের ৩২ শতাংশে জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক পদগুলোতে কোনো নারী নেই (চিত্র ৬)। পেশাগত শ্রেণিবিভাগ সময়ের পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সবসময়ই পরিব্যাপ্ত ছিল। উন্নত ও উন্নয়নশীল- উভয় প্রকারের দেশেই পুরুষদের শিল্প, বাণিজ্য, প্রকল্প ও যন্ত্র চালনার বিষয়ে, ব্যবস্থাপনা ও আইনসভার কাজে অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে, আর নারীদের মধ্যবর্তী দক্ষতার পেশা, যেমন- কেরানী, সেবাকর্মী এবং বিপণী বিতানে বিক্রয় ও বিপণনকর্মী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করতে দেয়া হয়েছে।

নারী এমনকি পুরুষের সমান শ্রম দিলেও পারিশ্রমিক পায় কম। পারিশ্রমিকের এই তারতম্য উচ্চতর পারিশ্রমিকের পেশার ক্ষেত্রে বৃহত্তর। বৈশ্বিকভাবে নারীরা পুরুষদের চেয়ে ২৪ শতাংশ কম আয় করে। ল্যাটিন আমেরিকাতে উচ্চ পদস্থ নারী ব্যবস্থাপকরা গড়ে যা আয় করেন, তা ওইসব পদে কর্মরত পুরুষদের গড় আয়ের মাত্র ৫৩ শতাংশ। বেশিরভাগ অঞ্চলেই নারীরা নিজের জন্যই শ্রম দিক অথবা অনানুষ্ঠানিকভাবে অন্যের জন্যেই দিক, ভঙ্গুর আয়ের বিনিময়ে ন্যূনতম অথবা বিনা সামাজিক ও অন্যান্য নিরাপত্তা নিয়ে নারীরা সবচেয়ে অসুবিধাজনক নিয়োগে কর্মরত আছেন বলে ধারণা করা হয়।

চিত্র ৬: বৈশ্বিক অঞ্চলভেদে ২০১৫ সালে ব্যবসা ক্ষেত্রে উচ্চপর্যায়ে নারীর উপস্থিতি

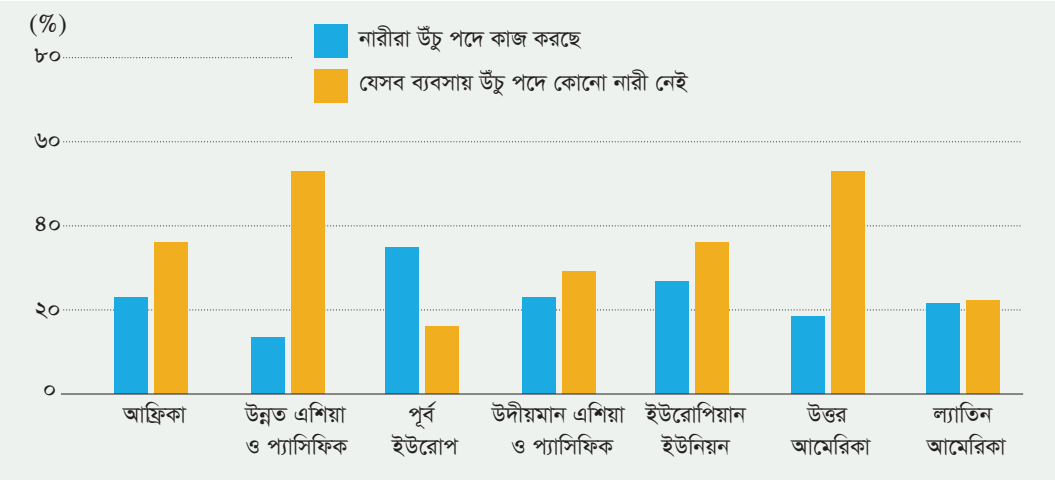

সূত্র: গ্র্যান্ট থর্নটন ২০১৫

নারীরা সেবামূলক কর্মের অসম বোঝা বহন করছে

বিশ্বজুড়ে নারীরা পারিশ্রমিকবিহীন সেবা কাজের সিংহভাগই সম্পাদন করে থাকেন, যার মধ্যে পড়ে গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজ (পরিবারের সবার খাবার তৈরি, জ্বালানির জন্য কাঠ সংগ্রহ করা, পানি সংগ্রহ করা) এবং পরিবার ও সমাজে বিভিন্নভাবে সেবা দেয়ার কাজ (শিশুদের লালন-পালন, সুস্থ ও বৃদ্ধদের দেখাশোনা করা)।

নারীদের জন্য সেবাকাজের এই অসম অংশের কারণে তারা শিক্ষাসহ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দেয়া অন্যান্য শ্রমের জন্য পুরুষদের তুলনায় কম সময় পান। তাদের নিজেদের কোনো কাজের জন্য অবসর সময়ও একই কারণে পান না তারা। ৬২টি দেশে এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, পুরুষরা দৈনিক ৪.৫ ঘণ্টা সময় সামাজিক জীবনে এবং অবসরে কাটান, নারীরা এক্ষেত্রে পান ৩.৯ ঘণ্টা। নিম্ন মানব উন্নয়নবিশিষ্ট দেশগুলোতে পুরুষরা নিজস্ব সামাজিক জীবন ও অবসরে নারীদের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি সময় ব্যায় করে। অত্যন্ত উচ্চ মানব উন্নয়নবিশিষ্ট দেশে এই পার্থক্য ১২ শতাংশ।

নারীরা পারিশ্রমিকসহ সেবাকাজেও অসমভাবে নিযুক্ত রয়েছেন। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গৃহকর্মীর চাহিদা বেড়েছে। সারা বিশ্বজুড়ে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ৫ কোটি ৩০ লাখ গৃহকর্মী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে ৮৩ শতাংশই নারী, যাদের মধ্যে প্রবাসী নারীরাও রয়েছেন। এর ফলে বিশ্বজুড়ে একটি সেবা অন্তর্জাল উদ্ভূত হয়েছে যেখানে নারীরা প্রবাসে গিয়ে গৃহস্থালির কাজে এবং শিশু ও অন্যান্যদের সেবাযত্নে শ্রম দেন। তবে বিদেশে শ্রম দিতে গিয়ে তারা প্রায়শই

নিজেদের সন্তান ও মা-বাবাদের ছেড়ে যান, যার ফলে সেবার এ ঘাটতি পূরণে মাতা/পিতামহী বা অন্যান্য আত্মীয় বা স্থানীয়ভাবে নিয়োগকৃত সহায়তাকারী সেবাশ্রম দেন।

গৃহকর্মীদের বিভিন্নভাবে অপব্যবহার, যেমন- কম পারিশ্রমিক দেয়া, অত্যন্ত নিম্নমানের কর্ম পরিবেশে রাখা, স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ না দেয়া এবং শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেও তারা নিপীড়নকারীদের অধীনে কাজ করতে বাধ্য হয়, কারণ তাদের কর্মসংস্থান প্রয়োজন। মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও সেবামূলক শ্রম সাধারণত: অস্বীকৃতই থেকে যায়। এর আংশিক কারণ হলো পারিশ্রমিকবিহীন হওয়ায় অর্থনৈতিক সূচকগুলোতে এর কোনো প্রতিফলন থাকে না।

তবে পারিশ্রমিকবিহীন সেবাকাজের মূল্য নির্ধারণ করলে গৃহস্থালি ও সমাজে সেবা কাজে নারীর অবদান লক্ষণীয় হবে এবং তাদের বাস্তবিক অবস্থা ও কল্যাণের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধন করবে, যা নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলবে। যেসব দেশ পারিশ্রমিকবিহীন সেবাকাজের মূল্য পরিমাপের পদক্ষেপ নিয়েছে তাদের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এর ব্যাপ্তি জিডিপি'র ২০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত। ভারতে পারিশ্রমিকবিহীন সেবাকাজের মূল্য জিডিপি'র ৩৯ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকাতে এর মান ১৫ শতাংশ।

নারীদের যখন পারিশ্রমিকবিহীন কাজকে অগ্রাধিকার দেয়া ব্যতীত কোনো উপায় থাকে না এবং তারা শ্রমশক্তির বাইরেই থেকে যান, তারা বিশাল এক আত্মত্যাগ করেন এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা প্রমাণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন তারা।

বৈতনিক এবং অবৈতনিক শ্রমের ভারসাম্যহীনতাকে আজকে ঠিক করতে পারলে বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম দুইই উপকৃত হবে

নারী ও পুরুষের মধ্যে কাজের অসমতা বদলাতে হবে। এটা ঠিক যে অনেক জায়গাতেই লক্ষণীয় পরিবর্তন আসছে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বাড়িতে নারী পুরুষ এখন সেবামূলক কাজ আরো সমানভাবে ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। কিন্তু শ্রম বিভাজনে এখনও নারী পুরুষের বৈষম্য প্রকট এবং ঠিক করতে হলে বহুদূর যেতে হবে। প্রজন্মান্তরের প্রচলিত অসম শ্রমবিভাজন নারীদের প্রথাগত গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখে এবং তাদের বেছে নেবার সুযোগ কমিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে মোটা দাগে চার ধরনের পদক্ষেপ প্রয়োজন। নারীদের অবৈতনিক শ্রমের ভাগ কমানো বৈতনিক শ্রমে নারীর সুযোগ সৃষ্টি করা, অবৈতনিক শ্রমক্ষেত্রে নারীদের সুবিধা বাড়ানো এবং রীতির পরিবর্তন করা।

অবৈতনিক শ্রমের সময় কমিয়ে তা আরো সুষমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। সুপেয় পানি, আধুনিক জ্বালানি, সামাজিক সেবার ব্যবস্থা দরকার। দরকার কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্যে সুবিধাজনক কর্মঘণ্টা এবং নারীদের প্রত্যাশার ব্যাপারে বা তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে আরো সংবেদনশীল মনোভাব যেন সেবামূলক কর্ম নারীদের ভাগ থেকে আরো কমে আসে।

উপযুক্ত আইন এবং সুনির্দিষ্ট নীতি আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে নারীর অভিগম্যতা বাড়াতে পারে। উন্নত মানের উচ্চশিক্ষায় নারীর অভিগম্যতা নিশ্চিত করে, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নারী কর্মী নিয়োগ দিয়ে, যেসব ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি কম সেখানে তা বাড়ান যেতে পারে।

সুষ্ঠু নীতি কর্মক্ষেত্রে নারীর অগ্রযাত্রার বাধাগুলোকে সরাতে পারে। এক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে নিপীড়ন, সমান পারিশ্রমিক, বাধ্যতামূলক প্রসূতি অবকাশ, সুষম সুযোগও নারীদের জন্যে কর্মক্ষেত্রে আরো ভালো ফল বয়ে আনতে পারে।

বৈতনিক প্রসূতি ছুটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সুষম ছুটির ব্যবস্থা এবং কর্মীদের তা নিতে উৎসাহিত করলে নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে, নারী-পুরুষের পারিশ্রমিকের বৈষম্য কমাবে এবং তাদের কর্মজীবনও আরো ভালো হবে। অনেক দেশেই এখন প্রসূতিকালীন ছুটি বাবা এবং মায়ের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেয়া হয়।

নারী-পুরুষের সক্ষমতার সমান প্রতিফলন নিশ্চিত করতে সামাজিক রীতিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। সবধরনের ক্ষেত্রেই নারীদের নীতিনির্ধারণী পদে দৃশ্যমান উন্নতি এবং অন্যদিকে প্রথাগতভাবে নারীর কর্মক্ষেত্র এমন ক্ষেত্রে পুরুষদের নিয়োগ সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে সাহায্য করবে।

টেকসই শ্রমের জন্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে

টেকসই শ্রম মানব উন্নয়নকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করে এবং ঋণাত্মক প্রভাবকগুলোকে ঠেকিয়ে দেয়। সবার জন্য শ্রম নিশ্চিত করা বা গোটা পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন কাজ।

সবার জন্য প্রযোজ্য এমন কিছু করার জন্য তিনটি বিষয়ে একই সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে

- বাতিল করা (কিছু শ্রম বাদ দিতে হবে)
- পরিবর্তন (বিনিয়োগকে কাজে লাগিয়ে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করা ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি)
- সৃষ্টিশীলতা (কিছু নতুন শ্রমের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে)

কিছু পেশা ধীরে ধীরে নতুন করে আবির্ভূত হতে পারে। যেমন গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলওয়ে সম্পর্কিত প্রযুক্তির প্রসার। ছাঁটাই হয়ে যাওয়া শ্রমিকেরা খনি বা এ ধরনের কাজ নিতে পারে যেখানে গ্রিনহাউজ গ্যাস বেশি বের হয়। প্রায় ৫ কোটি লোক এমন সব জায়গায় কর্মরত আছেন যা প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের মধ্যে সীমিত। ৭০ লক্ষ মানুষ শুধুমাত্র কয়লা খনিতেই কাজ করছেন।

চিত্র ৭: টেকসই শ্রমের ছক

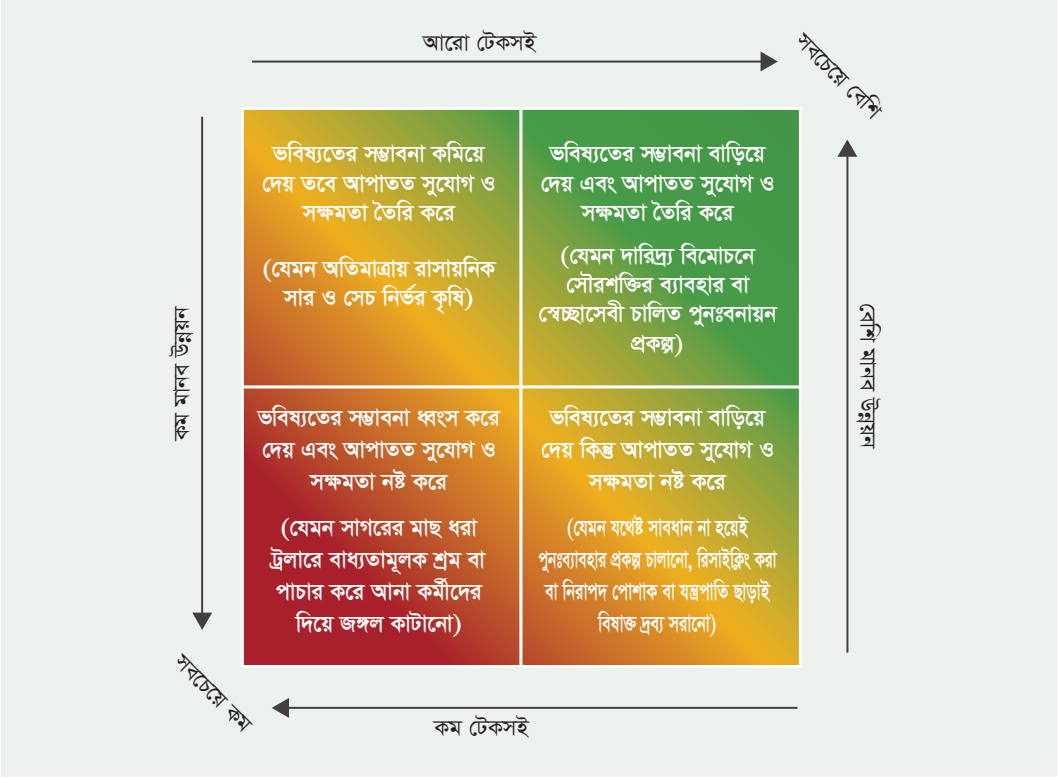

সূত্র: এইচ ডি আর ও

বিভিন্ন পেশায় পরিবর্তনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। বিশেষ করে যেখানে মানসম্মত কোনো কর্ম পরিবেশ বা নিরাপত্তা নাই, যেমন জাহাজ ভাঙা।

আবার ফটোভোল্টাইক প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলো আদতেই মানব উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারবে তা নির্ভর করবে উন্নত দেশগুলোতে প্রচলিত গ্রিড-ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে নাকি উন্নয়নশীল দেশগুলোর 'অফ-গ্রিড' ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে। তার সাথে যোগ হবে নবায়নযোগ্য জিনিসের ব্যবহার যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৭.১ (২০৩০-এর মধ্যে ব্যয়সাধ্য, নির্ভরযোগ্য এবং আধুনিক জ্বালানির নিশ্চয়তা) বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে।

টেকসই শ্রমের ভেতর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নিহিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে'র সাথে টেকসই শ্রমের বিন্যাস আট নম্বর লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত। যেখানে দৃঢ় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বেকারত্ব লাঘব এবং সবার জন্য মানানসই শ্রমের নিশ্চয়তার কথা বলা হয়েছে। ৮.৭ নং লক্ষ্য হলো জোরপূর্বক শ্রমের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা, আধুনিক দাসত্বের বিপক্ষে দাঁড়ানো, শিশুশ্রমের কুৎসিত রূপের বিপক্ষে দাঁড়ানো এবং ২০১৫ সাল নাগাদ সবরকম শিশুশ্রম বন্ধ করা।

টেকসই শ্রমের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য

লক্ষ্য নং ৮.৮-এ শ্রমিকের অধিকার, নিরাপদ কর্মস্থল, প্রবাসী শ্রমিকের অধিকার, নারী এবং প্রবাসী এমন শ্রমিকের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ এবং যারা অনিশ্চিত পেশায় আছেন তাদের শক্তির যোগান দিয়ে মানব উন্নয়ন সুগম করার মাধ্যমে জাতিকে পতনের হাত থেকে রক্ষার কথা বলা হয়েছে। লক্ষ্য ৮.৯-এ টেকসই পর্যটনের কথা বলা হয়েছে যার মাধ্যমে ২০৩০ সাল নাগাদ স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশ এর মাধ্যমে নতুন পেশা সৃষ্টি হবে।

সারণী-১: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

লক্ষ্য ০১	সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্য নির্মূল করা।
লক্ষ্য ০২	ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির নিশ্চিত করা ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু।
লক্ষ্য ০৩	স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সী মানুষের কল্যাণ বয়ে আনা।
লক্ষ্য ০৪	সবার জন্যে, সবাইকে নিয়ে, সবার সমান কাজে লাগে এমন মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।
লক্ষ্য ০৫	নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা এবং নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন ঘটানো।
লক্ষ্য ০৬	সবার জন্য সুপেয় পানির সহজপ্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।
লক্ষ্য ০৭	সবার জন্য ব্যয়সাধ্য, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিশ্চিত করা।
লক্ষ্য ০৮	সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল ও উপযুক্ত শ্রম নিশ্চিত করা।
লক্ষ্য ০৯	দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরি, সবাইকে নিয়ে টেকসই শিল্পায়ন নিশ্চিত করা এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করা।
লক্ষ্য ১০	বিশ্বব্যাপী বৈষম্য কমানো।
লক্ষ্য ১১	সবাইকে ঘিরে, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই শহর ও বসতি গড়ে তোলা।
লক্ষ্য ১২	সম্পদের পরিমিত উৎপাদন ও ভোগ দুইই নিশ্চিত করা।
লক্ষ্য ১৩	জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
লক্ষ্য ১৪	টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সেগুলোর দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা।
লক্ষ্য ১৫	পৃথিবীর ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা ও টেকসই ব্যবহার, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ রোধ, ভূমিক্ষয় রোধ ও বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্রের ক্ষতি রোধ করা।
লক্ষ্য ১৬	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ সমাজ তৈরি করা, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ রাখা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা।
লক্ষ্য ১৭	প্রণয়ননীতি জোরদার করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জীবিত করা।

লক্ষ্য ৩.১-এ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সারাবিশ্বে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে জোরারোপ করা হয়েছে। তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনে যেসব মানুষ জড়িত তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অন্য জীবিকা নির্ধারণ করতে হবে । ৯.৪-এ ২০৩০ সাল নাগাদ অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শিল্প এলাকা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে যার মাধ্যমে দক্ষতার বিকাশ ঘটবে এবং নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক দিকগুলোকে বিশেষভাবে বিবেচনা করে। লক্ষ্য ৮.৭ বাস্তবায়ন করলে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ শিশুশ্রমিক ও ২.১ কোটি বাধ্যতামূলক শ্রমিকের জীবনের মানোন্নয়ন হবে। ৫.২ নং লক্ষ্য অনুযায়ী পৃথিবীর ৪.৪ মিলিয়ন যৌন লাঞ্ছনার শিকার নারীকে সাহায্য করা হবে। ৩.ক অনুযায়ী তামাক শিল্পে ১০০ মিলিয়ন শ্রমিককে সেবা দেয়া হবে। এই ধরনের কাজকে অব্যাহত রাখতে হলে আরো মানুষকে এর সাথে সংযুক্ত হতে হবে। অন্যান্য লক্ষ্যগুলো শ্রমের বর্তমান অবস্থাকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে নতুন পথে এগিয়ে যায়।

লক্ষ্য ২ অনুযায়ী, কৃষিব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুধা ও খাদ্য নিরাপত্তা দেয়ার পাশাপাশি কৃষিতে নতুন অনেক মানুষের জীবিকা সৃষ্টি করা হবে। পৃথিবীতে প্রায় একশ' কোটির বেশি মানুষ প্রাথমিক শিল্পে যেমন কৃষিক্ষেত্র, মৎস্য শিকার, বনায়নে নিয়োজিত যারা দৈনিক ১.২৫ ডলারের কম আয় করে। গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের জন্য মাটি ও পানিসম্পদের বেপরোয়া ব্যবহার বনভূমি উজাড়ে দায়ী এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

যে প্রক্রিয়াগুলো কৃষকেরা জমি চাষের জন্য অবলম্বন করেন তা বেশ জটিল। আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে নতুন পন্থা খুঁজে বের করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমস্ত উৎপাদিত খাদ্যের এক তৃতীয়াংশ নষ্ট করা হয় বা হারিয়ে যায়। বিস্তারিত কর্মপন্থা নির্ধারণের মাধ্যমে কম সময়ে অধিক ফসল ফলাবার চেষ্টা করতে হবে।

পরিবেশগত স্থিতিশীলতার জন্য নতুন কাঠামোগত উন্নয়ন ও নির্মাণ জরুরী (লক্ষ্য ৯.৪)। শক্তি প্রকল্প প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে (লক্ষ্য ৭)। ২০১৪ সালে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নবায়নযোগ্য শক্তির মাধ্যমে ৭.৭ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। সোলার ফটোভল্টাইকের মাধ্যমেই কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ২৫ লাখ মানুষের।

পৃথিবী নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে কিন্তু মানব উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা আগের মতই আছে বরং আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।মানব উন্নয়ন এর পদক্ষেপগুলো নেয়ার পর থেকে ১৯৯০-এর তুলনায় আজকের পৃথিবী অনেক পরিবর্তিত। মূলত তখন থেকেই উন্নয়নের প্রচ্ছদ পালটে গেছে। বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রগুলো নির্ধারিত হয়েছে, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তনকে কাজে লাগানো হয়েছে এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলো মানুষের কাছে বোধগম্য ও বিস্তৃত হয়েছে।

বৈশ্বিক অর্থনীতি পরিবর্তিত হচ্ছে। এই বিস্তৃত হতে থাকা অর্থনীতি ক্রমেই বেড়ে উঠছে। ২০০৪ সালে থেকে ২০১৪ সালে উন্নত দেশগুলোর জিডিপি ৫৪ থেকে ৪৩ শতাংশে নেমে । রাজনৈতিকভাবে মানুষের স্বাধীন সত্ত্বাটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আজ মৃতপ্রায়। ডিজিটাল বিপ্লব আমাদের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। জননিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রাণের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাহলে, মানব উন্নয়নকে কি এখনও মানুষের উন্নত জীবন যাত্রার পরিমাপ ধরা হয়? হ্যাঁ- আজকের বিশ্বে এটি আরো বেশী স্বীকৃত।

সকল অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিনির্ভর অগ্রগতি আজ উল্টোপথে হাঁটতে শুরু করেছে। প্রগতি থেকে মানুষ কোনো সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে না। মানুষের শ্রমের সুযোগ ও নিরাপত্তা হুমকির মুখে। অতীতের মতোই লিঙ্গ বৈষম্য আজও বিদ্যমান। শিশুদের প্রতি যতটুকু মনোযোগ দেয়া দরকার সেটাও দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। অধিকন্তু মানব উন্নয়নের ধারণাটি মানুষের স্বাস্থ্যকর ও সৃজনশীল জীবনের মাধ্যমে নিজের ইচ্ছার প্রতিফলন কতখানি থাকে তার ওপর নির্ভর করে। অনুরূপভাবে মানব উন্নয়ন প্রকল্প নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ করে। এখন সময় এসেছে অভিমত ও পদক্ষেপ এর যুগলবন্দীকে কাজে লাগানোর।

আজকের বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার জন্য যে পদক্ষেপ নেয়া জরুরী

দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের জন্য মানব উন্নয়নের জন্য আরো কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি ভিত্তি দরকার যা ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে।

ব্যক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে ব্যবসার ভিত্তিগুলোকে ঠিক রাখতে হবে। যেমন- সম্ভাব্য পতন ফেরানো, বিভিন্ন মতপার্থক্যকে বিবেচনা করা, পদ সংক্রান্ত সমতাবিধান, বর্তমান-ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রভৃতি। কিন্তু স্থিতিশীলতা, অভিঘাত ও দুর্বলতার মাঝে মানব উন্নয়ন এবং মানব নিরাপত্তা ও অধিকার এই বিষয়গুলো আবার ফিরে দেখা উচিত।

২০৩০ সালের এজেন্ডা অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নতুন বিশ্লেষণী মাধ্যম দরকার যেখানে মনিটরিং এর মাধ্যমে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একই সাথে পরিবেশগত স্থিতিশীলতা ও এটিকে মানব কল্যাণের সাথে একত্র করা সবচেয়ে জরুরী।

আরো তিনটি চ্যালেঞ্জ রয়ে যায়; প্রথমত, পদক্ষেপগুলো এমন হতে হবে যা মূলনীতির সাথে খুব তাড়াতাড়ি খাপ খেয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, বেশিরভাগ ক্রান্তিকালে নেয়া পদক্ষেপগুলো অপ্রতুল হয়। তৃতীয়ত, তাৎক্ষণিক দিকনির্দেশনা'র বিষয়গুলোতে আরো বিস্তৃতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এসকল প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য। এসব কিছু গণনা করে এবং আরো উচ্চাভিলাষী আন্তর্জাতিক এজেন্ডা বিবেচনা করে জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেল ২০১৪ সালে একটি হাই-লেভেল প্যানেলের ২০১৫-পরবর্তী এজেন্ডা ঠিক করে। এখানে তথ্য বিপ্লব এর আহ্বান দেয়া হয়। এটির অগ্রগতি ধারা মনিটর করার ওপর জোর দেয়। এখানে তিনটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:

- প্রথমত, প্রচুর পরিমাণে জীবন থেকে নেয়া উপাত্ত অনেক ভালো তথ্য সরবরাহ করে যেমনঃ স্কুলের উপস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য। স্যাটেলাইট বা সেন্সর মানুষের কাজকর্ম সম্পর্কিত অনেক তথ্যের জোগান দেয়। এগুলো নিয়ন্ত্রণ এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ করা যায়।

- দ্বিতীয়ত, আদমশুমারীর মতো বড় ধরনের তথ্য উপাত্ত মুহূর্তের ভেতর কোনো বড় সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এই ধরনের উপাত্ত অর্থবোধক কার্যকারণ সৃষ্টি করে যা মানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে। কিন্তু তথ্য উপাত্তের কিছুটা ভয়ও আছে। যেখানে পরিস্থিতি ভালো নয় সেখানে প্রচুর তথ্য উপাত্তের প্রবাহ অনেকসময় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবু অনেক গবেষক বিশাল তথ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। ঘটনাপ্রবাহ ধরে তারা বিন্যস্তরূপে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে গবেষণার বিষয় করে তুলে আরেকটু ভালো জীবনযাত্রার দিকে নিয়ে যেতে চান।

- তৃতীয়ত, তথ্য সংগ্রহের জন্য ঐতিহ্যগত পদ্ধতির পাশাপাশি নতুন পদ্ধতিও ব্যবহার করতে হবে। প্রশাসনিক রেজিস্টার থেকে মোবাইল ডিভাইসে তথ্য বিন্যস্তকরণ, জিও-স্পেশিয়াল তথ্য ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের নতুন পথগুলো পৃথিবীর অনেক দেশেই কাজে লাগানো হচ্ছে।

পরিবর্তিত এবং পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নতুন করে কোনো উন্নয়নের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানব উন্নয়নের ২৫ বছর পুরনো ধারণাগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। সামনের বছরের মানব উন্নয়ন রিপোর্টটি পঁচিশতম, সেখানে মানব উন্নয়নের লক্ষ্যগুলোকে বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা থাকবে।

শ্রমের প্রয়োজন এবং নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মপরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে মানব উন্নয়ন বাড়ানো

শ্রমের মাধ্যমে মানব উন্নয়নের জন্যে তিনটি মাত্রা থেকে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। কাজ বেছে নেবার সুযোগ বাড়াতে হবে, শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে যেন মানব উন্নয়ন এবং শ্রমের ইতিবাচক সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয় এবং বিশেষ কিছু মানুষের প্রেক্ষিতে বা নিরিখে সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া। এক্ষেত্রে ত্বরণ ঘটানোর জন্যে একটি কর্মপরিকল্পনাও প্রয়োজন যার মূল তিনটি উপাদান হবে নতুন সামাজিক চুক্তি, বৈশ্বিক সমঝোতা এবং সুষ্ঠু কাজ নিশ্চিত করার এজেন্ডা (চিত্র ৮)।

চিত্র ৮: শ্রমের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন বয়ে আনার নীতিমালা

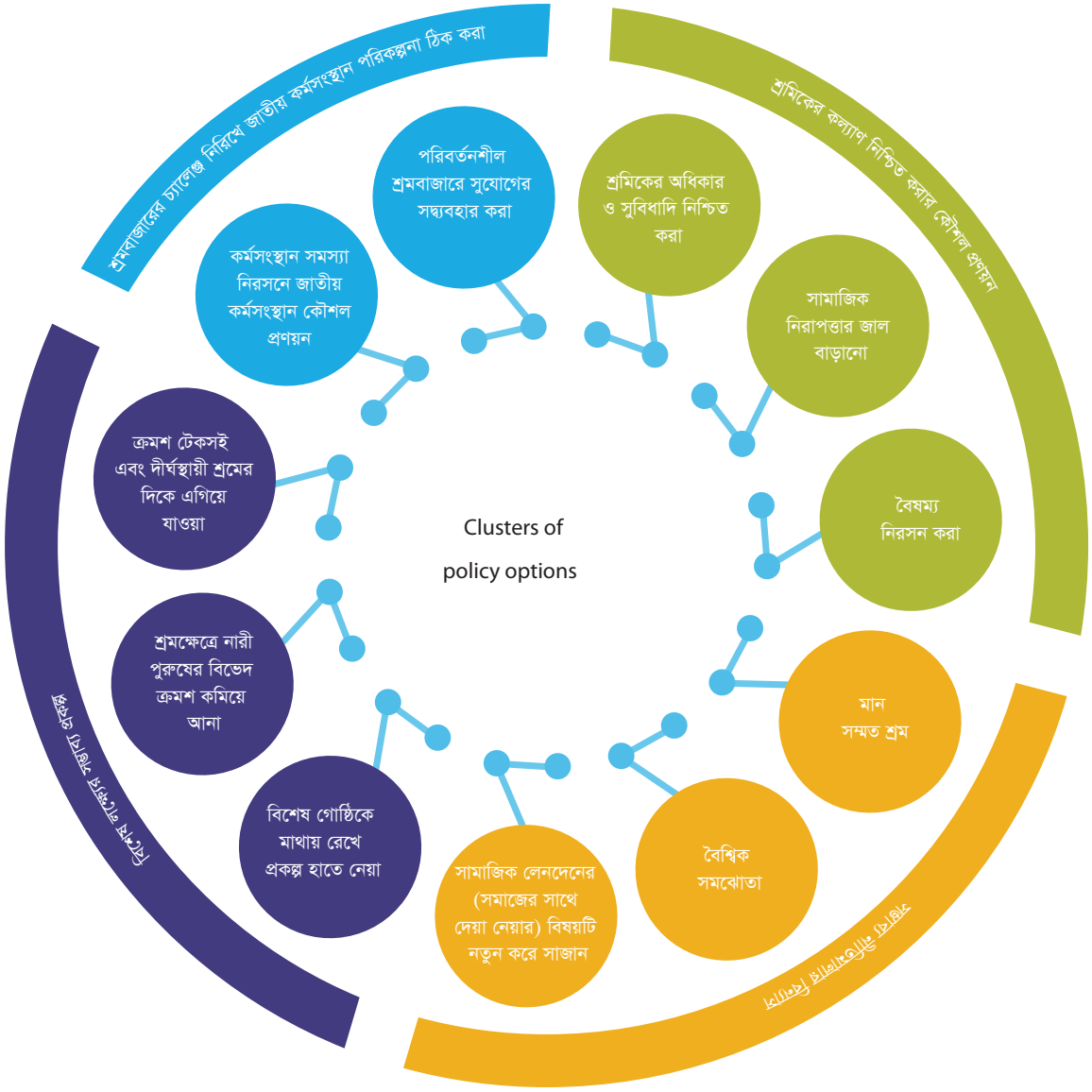

সূত্রঃ এইচ ডি আর ও

পরিবর্তিত শ্রমবাজারে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ

মানব উন্নয়নের জন্য শ্রম মানে শুধু পেশা নয় বরং মানব উন্নয়ন বলতে বেছে নেবার সুযোগ বৃদ্ধি ও কর্ম সম্ভাবনার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা বোঝায়। এই কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যারা নির্দিষ্ট বেতনের কাজ ভালোবাসেন তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী কাজ বেছে নিতে পারবেন। জাতীয়ভাবে 'কর্ম কৌশল' নির্ধারণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে এই প্রতিকূল চাকরির বাজারকে মোকাবেলা করতে হবে। প্রায় সাতাশটি উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় কর্ম কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। আরো আঠারোটি দেশে এর কাজ শুরু হয়েছে এবং পাঁচটি দেশ নতুন দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার স্বার্থে তাদের পরিকল্পনাগুলোকে নতুন করে সংগঠিত করছে। কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী বিষয়গুলো তুলে ধরা যাক -

- শ্রমের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ: এক ডজনেরও বেশি দেশ তার জনগণের কর্ম লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে (হন্ডুরাস ও ইন্দোনেশিয়া সহ)। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো একইসাথে দুটি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। প্রাথমিকভাবে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কাজ শুরু করে বিভিন্ন ভাসমান পেশার লাগামহীন বিস্তৃতি রোধ করা যেতে পারে। ফলে অনাগত লক্ষ্যগুলো পূরণের পথ সহজ হবে। তারা একটি সুনির্দিষ্ট মনিটরিং পলিসিও গ্রহণ করতে পারেন। এতে নতুন কর্ম সম্ভাবনা তৈরি হবে যেমনটা ইতিমধ্যে ভারত, কলম্বিয়া, চীন, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে হয়েছে।

- নতুন কর্মসংস্থানের বীজ বপন: এখনকার সময়ে জীবিকাকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চালিকা হিসেবে চিন্তা না করাই ভালো। দ্বিমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ছোট ও মধ্যম আকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একপ্রকার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। যার ফলে পুঁজির চাহিদার সময় বড় পুঁজি পাওয়া যায় যেটা কর্মক্ষেত্র বাড়ায়। এই পুঁজি শ্রমিকদের দক্ষ করে। এই পদক্ষেপ তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে দুর্বল জনগোষ্ঠীতে পুঁজি বিনিয়োগে (যেমন কৃষিক্ষেত্রে)। জীবিকার প্রবাহ সচল রাখতে জটিল বাধা দূর হয়। নিয়ম মতো দিকনির্দেশনা পালন করলে আর পুঁজির বিনিয়োগ সঠিক থাকলে এমন অনেক প্রযুক্তি সামনে চলে আসবে যা নতুন কর্মসংস্থান করে।

- অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক মুক্তির পথে হাঁটা: একটি অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ভিত্তি নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরিতে ও কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য একান্ত দরকারি বিষয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অভাবটা তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন নারীরা। নীতি নির্ধারকদের সম্প্রসারিত সহজ ব্যাংকিং সুবিধার দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং বঞ্চিতদের প্রাধান্য দিতে হবে। যেমনটা ইকুয়েডরে ঘটেছে। আগে থেকে চিহ্নিত অঞ্চলে মূলধনকে ছড়িয়ে দিতে হবে (কোরিয়া, আর্জেন্টিনা বা মালয়েশিয়া এর উদাহরণ। সুদের হার কমিয়ে ও মূলধনের নিশ্চয়তা দিয়ে মধ্য ও ছোট ব্যবসায়ীদের রপ্তানিতে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

- সহায়ক অর্থনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণ: অকালে ঝরে যাওয়া ব্যবসাগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য নতুন পন্থা বেছে নিতে হবে । মূল ব্যবসায়িক নীতি ঠিক রেখে জীবিকাগুলোর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সৃষ্টি করতে হবে। বাজেটকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। সরকারি কোষাগারে জমা হবার মতো অর্থের যোগান যেন থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। একটি ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার যেখানে প্রতিযোগিতা থাকবে, থাকবে স্বচ্ছতা ও ব্যবসায়িক একাগ্রতা।

এই পাল্টানো সময়ে সম্ভাবনাগুলোকে সময়মতো কাজে লাগানোর মাধ্যমে দুর্দশার ভেতর থাকা মানুষগুলোর কর্মসংস্থান হবে। ব্যক্তিপর্যায়ে জ্ঞানী ও দক্ষ যে কেউ নতুন প্রযুক্তির সহায়তায় ব্যবসার প্রসারের সুযোগ পাবে। কিছু পদক্ষেপ এমন হতে পারে যে-

- অবনমন থেকে ফেরানো: বিশ্বায়নের ফলে শুধু যে জীবিকার মানের অবনতি আর শ্রমিকের বেতন হ্রাস হয়েছে ব্যাপারটা তা নয়। এর ফলে সারাবিশ্বের মনোযোগ এখন মার্জিত বেতন ও শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে ফিরেছে। পরিষ্কার লেনদেন এবং শক্তিশালী ব্যবসায়িক ভিত্তি- ক্রমে জটিল হয়ে উঠা ভোক্তার চাহিদা পূরণের পূর্বশর্ত বলা চলে।

- কর্মীদের শিক্ষিত ও দক্ষ করে তোলা: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর কাজের জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হবে। অন্যান্য কাজের জন্যও সৃজনশীলতা এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং খারাপ দিকগুলো বন্ধ করার জন্য যে সিদ্ধান্তগুলো নেয়া যেতে পারে -

- আইন প্রণয়ন করা ও আইন মান্য করার অভ্যাস তৈরি করা: সম্মিলিত দরকষাকষি, বেকার-বীমা, ন্যূনতম ভাতা, শ্রমিকদের কাজ সংক্রান্ত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের রীতি চালু করতে হবে। আন্তর্জাতিক আটটি শ্রম সংস্থার কনভেনশন বাস্তবায়ন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (চিত্র: ৯)

চিত্র ৯: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর তালিকা, ১৯৯০ এবং ২০১৪

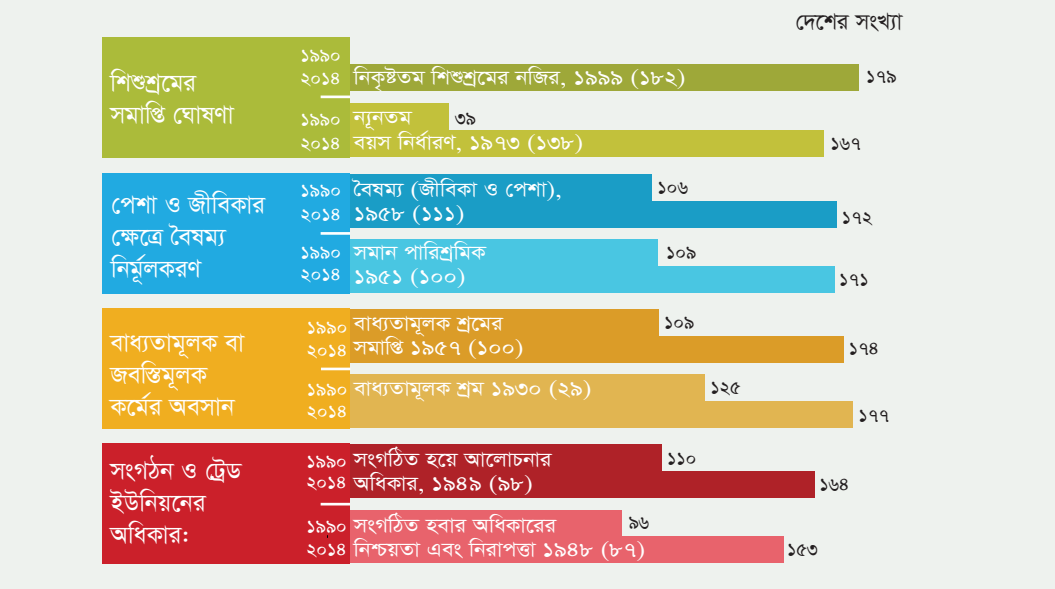

সূত্র: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (২০১৪) তথ্যের ভিত্তিতে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তরের হিসাব।

- প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা: কর্মক্ষেত্রে এমন হতে হবে যেন যথাযথ কাজের পরিবেশ থাকে। রাষ্ট্র চাইলেই প্রচলিত প্রথাগুলো ভেঙে দিয়ে সম্পূর্ণ সক্ষম নয় এমন মানুষদেরকে কাজে লাগাতে পারে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তি ও অনুকূল কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি।

- সীমান্তে শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা: অন্যান্য দেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো টাকার ব্যাপারে নিরাপত্তা দিতে হবে। প্রবাসী অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। আঞ্চলিক ও আন্তদেশীয় দুটি ক্ষেত্রেই শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে হবে।

- ট্রেড ইউনিয়ন এবং সংগঠিত কষাকষি: বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রেক্ষিতে বদলাতে থাকা শ্রম বাজারে টিকে থাকতে হলে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে। ভারতের আত্মনির্ভর (যারা নিজেই নিজের নিয়োগকর্তা) নারী সংগঠনের উদাহরণ দেয়া যায়। এই পরিবর্তনশীল বাজারে প্রয়োজন ভিন্ন মাত্রার কোনো পন্থা এবং বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সেবাদানকারীদের সংগঠন। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিল্যান্সারস ইউনয়ন একটি উদাহরণ হতে পারে, বা শান্তিপূর্ন প্রতিবাদ হতে পারে।

শ্রমিকদের অধিকার, সুবিধাদি ও সামাজিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা মানব উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

বিশ্বের মাত্র সাতাশ ভাগ মানুষ সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। এই সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য করণীয় হতে পারে:

- লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে পরিকল্পিত ব্যবসা পরিচালনা: যেকোনো লেনদেনের ব্যাপারে নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টাকার বিনিময়ে বস্তু বা শ্রমের ব্যবহার ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় অনেকখানি ঝুঁকি কমিয়ে নিয়ে। সম্পদকে সচল করার জন্য বৃদ্ধিশীল কর, পুনর্গঠিত ব্যয় বা অন্যান্য সাহায্যকারী কৌশলের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

- সামাজিক প্রতিরক্ষার সাথে শ্রম-কৌশলের মেলবন্ধন: এমন সব শ্রম-পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যা গরীবদের উপকারে আসবে এবং ধীরে ধীরে একটি সামাজিক নিরাপত্তার জাল তৈরি সম্ভব হবে।

- সুষ্ঠু উপার্জনের নিশ্চয়তাঃ এটি প্রত্যেকের জন্যে নির্ধারিত ন্যুনতম আয়। এই উপার্জনের সাথে কর্মক্ষেত্রের কোনো সম্পর্ক থাকবেনা। যারা অবৈতনিক শ্রমে নিয়োজিত তাদের জন্যে এমন নীতি কাজে দেবে।

- সামাজিক নিরাপত্তার পরিকল্পনাগুলো লোকালয়ে ছড়িয়ে দেয়া: এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় অর্থ পরিবহন সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। ল্যাতিন আমেরিকার দিকে তাকালে সহজেই তা বোঝা যায়। একে ব্রাজিলে 'Bolsafamilia' আর মেক্সিকোতে 'Prospera' বলা হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বিষয়টি চালু করা সম্ভব।

- নিশ্চিত কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা: অনেকগুলো দেশে নিশ্চয়তা দিয়ে কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেমন ভারতের গ্রামগুলোতে জাতীয় কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামগুলোতে বেকারত্ব ঘুচেছে।

- বয়স্কদের জন্য পরিকল্পনা: পেনসনের মাধ্যমে কিছু টাকা পেলেও বয়স্কদের জন্য কাজের সুযোগ সাধারণত কম থাকে। সামাজিক ভাতা নির্ধারণের মাধ্যমে বয়স্কদের পরিপূর্ণ ভাতার ব্যবস্থা হবে। চিলিতে যা করা হয়েছে।

শ্রমিকেরা যে অংশটুকু পাচ্ছে তা অর্থনৈতিকভাবে একেবারেই তলানিস্বরূপ। এই অবস্থার উন্নতি করতে হলে নীতিনির্ধারণী গোষ্ঠীকে যে বিষয়গুলোকে মাথায় রাখতে হবে -

- দরিদ্রবান্ধব পরিকল্পনা: তুলনামূলক বেশি গরীবরা যেখানে কাজ করে সেখানে এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। তাদের ঘরবাড়ি, স্বাস্থ্য, আর স্যানিটেশনের দিকে মনোযোগ দেয়ার পাশাপাশি তাদের অর্থনীতির দিকেও নজর দিতে হবে। সর্বোপরি তাদের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার বিনিয়োগ সুষ্ঠু হতে হবে।

- শ্রমের উন্নতির জন্য সহায়তা: বিপণন সুবিধা, বিনিয়োগ ও মূলত গ্রামাঞ্চলে অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারনমূলক সেবা বাড়ানো এবং শ্রমঘন প্রযুক্তি শ্রমের সুযোগের অসমতা কমায়। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঠিক প্রণোদনার মাধ্যমে এইধরনের অবকাঠামো পরিচালনায় উৎসাহিত করা যেতে পারে।

- বৈশ্বিক ও জাতীয়ভাবে শিক্ষাকে সর্বস্তরে, বিশেষ করে স্নাতক ও পরবর্তি পর্যায়ে, ছড়িয়ে দেয়া: বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ওপর সব দেশেই জোর দেয়া হলেও সীমিত অভিগম্যতার কারণে বৈষম্য থেকেই যায় যা বিভিন্ন দেশের উদাহরণ থেকে দেখা যায়। স্নাতক ডিগ্রীধারী কর্মীরা স্বচ্ছল পরিবারের হয়ে থাকে বেশীর ভাগ সময়। দেশের মধ্যেও একই ধরনের বৈষম্যের আভাস পাওয়া যায় কারণ উন্নত দেশগুলোই আসলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আদতেই সম্প্রসারিত করতে পেরেছে।

- মালিক ও কর্মচারীদের ভেতর অর্থের সুষ্ঠু ভাগবাটোয়ারা: ব্যবসার লভ্যাংশকে সমানভাবে ভাগ করলে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের ভেতর আয়বৈষম্য কমে আসবে।

- সুষম বণ্টন নীতিমালা গ্রহণ এবং প্রণয়ন: এই পদক্ষেপের মধ্যে থাকতে পারে প্রগতিশীল আয় ও সম্পদ কর ব্যবস্থা, ভাড়া কমানোর জন্যে বিধি তৈরি, আরো শক্ত বিধি তৈরি করা এবং দরিদ্রদের মাথায় রেখে সুনির্দিষ্টভাবে সরকারি অর্থ ব্যয় করা।

- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এমন বিধির ব্যবস্থা করা যেন অর্থনীতির ওঠানামার কি প্রভাব কমে আসে: উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মসংস্থান সম্ভব যেখানে চাকুরী কম নাজুক হবে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে যদি বিনিয়োগ বাড়ে যেখানে সেরকম উৎপাদন নেই, যেমন পুঁজিবাজার, তার মাধ্যমে আসলে না হবে অধিক মাত্রায় কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা না হবে সেই চাকুরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

- শ্রমের গতিশীলতা ও পুঁজির মধ্যকার অসামঞ্জস্য দূরীকরণ: শ্রমের গতিশীলতার সাথে পুঁজির পার্থক্য রয়েছে। শিল্পোন্নত দেশগুলো গতিশীল পুঁজির পক্ষে হলেও, শ্রমের ক্ষেত্রে গতিশীলতার পছন্দ করেনা। তবে বিধির মাধ্যমে পুঁজির নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে মধ্যম আয়ের ফাঁদ থেকে রক্ষা করা যায়, যেন মজুরী বেড়ে গেলেই পুঁজি ঐ দেশ ছেড়ে আরেক দেশে না যেতে পারে। অভিবাসন নীতির মাধ্যমে এর ঝুঁকিরও কিছুটা নিরসন হতে পারে।

সেবামূলক কাজ এবং বৈতনিক শ্রমের ভারসাম্য ঠিক করার জন্যে, শ্রমকে টেকসই করার জন্য, যুবকদের বেকারত্ব, সৃষ্টিশীল স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে উৎসাহ দিতে এবং সংঘাতময় ও সংঘাত পরবর্তী অঞ্চলে সেবা দেবার জন্যে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ

বৈতনিক ও অবৈতনিক শ্রমে নারী পুরুষের অসমতা কমানো এবং সমন্বয়সাধনের জন্য করণীয়:

- নারীদের বৈতনিক কর্মসংস্থানের পক্ষে সংবেদনশীল নীতি সম্প্রসারণ এবং আরো জোরদার করতে হবেঃ শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের সক্ষমতা বাড়ানো যেতে পারে। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিকদের শিক্ষাদীক্ষা বিশেষত গণিত ও বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার মাধ্যমে পেশাদার উন্নতি নিশ্চিত করতে হবে।

- গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী পদে নারী প্রতিনিধিত্বের পক্ষে পদক্ষেপ: সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানার ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে নতুন কর্মীনিয়োগের মতো বিষয়গুলোয় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বড় পদগুলোতে পুরুষ ও নারীর নিয়োগ পদ্ধতি একই হতে হবে। মেন্টরিং এবং কোচিং কর্মক্ষেত্রে নারীদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ ম্যানেজার পদে মহিলারা সহজেই অন্যদের শিক্ষিত করে তুলতে পারেন।

- সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা: কর্মক্ষেত্রে লাঞ্ছনা, বিষম নিয়োগপ্রক্রিয়া, অর্থ এবং প্রযুক্তিতে কম অভিগম্যতার মতো নারী পুরুষের অসমতাকে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঠিক করতে হবে।

- মাতৃত্ব এবং পিতৃত্বকালীন ছুটি: মাতৃত্ব এবং পিতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে নীতি হতে পারে এমন যে মা এবং বাবা দুজনের জন্যেই সেই ছুটি সমান। এমনকি কোনো প্রতিষ্ঠান যদি পিতৃত্বকালীন ছুটি চাইলে তার জন্যে ছোট্ট প্রণোদনার ব্যবস্থা করে তবে নতুন বাবারা এই ছুটি নিতেও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে।

- শ্রমের পরিবেশ তৈরিতে সামাজিক সুবিধাদি প্রদান: ডে-কেয়ার সেন্টার এবং কর্মক্ষেত্রে চাইল্ড কেয়ার সেন্টারের কার্যক্রমের পাশাপাশি গৃহায়ণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকের সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করা যেতে পারে। অথবা ভাউচার বা টিকিটের মাধ্যমেও সামাজিক সুবিধাদি প্রদান করা যেতে পারে।

- টেলিযোগাযোগ সহ শিথিল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা: মাতৃত্বকালীন ছুটির পর কর্মস্থানে ফিরে আসার জন্যে নারীদের জন্যে যথেষ্ট উৎসাহমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। হতে পারে তাদের পদ এক বছরের জন্যে ফাঁকা রাখা হবে কিংবা ছুটি শেষে ফিরলে তাদের বেতন বাড়ানো হবে। শিথিল কর্মঘণ্টা এবং টেলিফোনের মাধ্যমে কাজ করতে চাইলে সে ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা দরকার। এতে বৈতনিক এবং অবৈতনিক শ্রমে নারী পুরুষের অসমতা কমবে।

- ভালো কাজের মূল্যায়ন: যেসব শ্রমের জন্য সাধারণত টাকা দেয়া হয় না সেসব শ্রমকে সমাজ থেকে পুরস্কার বা বেতন দেয়ার রেওয়াজ চালু করা যেতে পারে।

- বৈতনিক ও অবৈতনিক শ্রমের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ: জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা অনুযায়ী দেশের সর্বস্তরে বৈতনিক এবং অবৈতনিক শ্রম নিয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। এই সমীক্ষার জন্য যথাযথ প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে।

নিরবচ্ছিন্ন শ্রম ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে মানব উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রাখার পাশাপাশি কিছু শ্রমকে বাদ দিতে হবে, কিছু শ্রমকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। নীতি নির্ধারকগণ নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করতে পারেন-

- নতুন বিনিয়োগের উদ্দীপনা যোগানো এবং ব্যতিক্রমী প্রযুক্তি ব্যবহার: ব্যবসায়িক প্রয়োজনের বাইরে নতুন বিনিয়োগকে স্বাগত জানানোর মানসিকতা তৈরি করতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমশক্তির পরিবহনকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

- অসমতা মোচনে ভূমিকা রাখা ও ব্যক্তি উদ্যোগকে প্রেরণা যোগানো: মানুষের শ্রমের স্বাভাবিক দিকটির বাইরে মহান দিকটির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এমন অনেক কাজ আছে যা ব্যক্তির একার লাভের বিষয় না হয়ে সবার জন্য উপকার হিসেবে আবির্ভূত হয়। এমন অবস্থায় সামাজিক ভাতার ব্যবস্থা করা যায়। যেখানে ব্যক্তির নিয়মিত আয়ের পাশাপাশি সমাজের হিতকর কাজের জন্য তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। (যেমন - বনরক্ষার কাজ)

- একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে: উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, পরিবেশবাদী আন্দোলনের কারণে কয়লা খনি বন্ধ হয়ে গেলে সেখানকার বেকার হওয়া শ্রমিকদের সহায়তা দেয়া, কিংবা জাহাজভাঙ্গার মতো শিল্পে কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্যে চাপ দেওয়া এবং প্রাথমিকভাবে বহু শ্রমিকের চাকরি হুমকির মুখে ফেলা। এক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা করে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে হবে।

আরেকটি বিষয় হলো, বৈশ্বিক প্রাপ্তি নিরূপণের জন্য দেশগুলোর ভূমিকা কতটুকু তা জানার জন্য একটি ব্যবস্থা দরকার। (বাক্স ৩)

বাক্স ৩: টেকসই কর্ম সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহ

- যথাযথ প্রযুক্তি এবং লিপফ্রগিংয়ের সুযোগসহ বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগের সুযোগ সনাক্ত করা
- টেকসই নীতিমালা প্রণয়নের সুবিধার্থে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও ব্যষ্টিক অর্থনীতি বিষয়ক কর্মপন্থা তৈরি
- জনসমষ্টির জন্য যথাযথ দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করা, যাতে প্রযুক্তি বিষয়ক ও উচ্চপর্যায়ের দক্ষতাসহ কর্ম সম্পাদনের এবং যোগাযোগ বিষয়ক মৌলিক দক্ষতাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- কৃষিখাতের মতো অনানুষ্ঠানিক কিন্তু বৃহৎ খাতগুলোর বিপুল সংখ্যক কর্মীদের আধুনিক পন্থায় পুনরায় প্রশিক্ষিত করতে হবে। কিছু সংখ্যক কর্মী মুক্তবাজারে চলে গেলেও গণ, বেসরকারি ও অন্যান্য খাতের সাহায্য নিয়ে অন্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব প্রকল্প নারী ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অন্যান্য গোষ্ঠীকে সহায়তা দেয়ার জন্য সহায়ক হতে পারে।
- প্রজন্মান্তরে চলে আসা অসমতা ভাঙ্গার জন্যে তা থেকে সমসুযোগের ব্যবস্থায় পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ে বহুমাত্রিক প্যাকেজ সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবসমূহ দূর করতে হবে
- কর্মদক্ষতাসম্পন্ন জনসংখ্যা তৈরি অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য জনগণকে শিক্ষামুখী করতে সামষ্টিক উদ্যোগ সমৃদ্ধ জীবনচক্র অভিগমন প্রয়োজন। দক্ষতা তৈরির ক্ষেত্রে গণখাতগুলোর ভূমিকা চলমান রাখতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো গণ খাতগুলোতে উন্নত মান ও অধিক সংখ্যক কর্মী তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন।

সূত্র: অ্যাটকিনসন (২০১৫)

যে বিষয়গুলো উপরে আলোচনা করা হলো, বিশেষত- শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতার বিষয়টি যুব সমাজের বেকারত্ব ঘুচানোর সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু বেকারত্বের এই বহুমাত্রিক (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক) চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এখানে মধ্যস্থতার মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যাওয়া উচিত। যুবসমাজের জন্য আকর্ষণীয় শ্রমবাজার তৈরি করতে হবে যেখানে তাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ সহজ হবে এবং নতুন ব্যবসায় ঝুঁকি গ্রহণে তারা আগ্রহী হয়ে উঠবেন।
এ বিষয়ে করণীয়-

- নতুন সৃষ্টি হওয়া শ্রমবাজারে কাজের নতুন ধারা চালুর মাধ্যমে সাহায্য করা: নতুন শ্রমবাজারের জন্য নতুন সুবিধা আবিষ্কারের পাশাপাশি নীতিগত সমর্থন বেশি দরকারি বিষয়।

- কারিগরি দক্ষতায় বিনিয়োগ, সৃজনশীল কাজ এবং সমস্যার সমাধান করা: যুবসমাজের জন্য বিশেষ সুবিধার মাধ্যমে ব্যবসায়িক শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা তৈরি করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কারিগরী প্রশিক্ষণ এবং ব্যবহারিক শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে।

- ঝুঁকি গ্রহণকারী নতুন ব্যবসায়ীকে সরকারি সহায়তা দেয়া: ব্যবসার একটা প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপনের জন্য উপদেশমূলক সহায়তা, অর্থনৈতিক ও যন্ত্রসুবিধা সংক্রান্ত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। ছোট ছোট উদ্যোগের জন্য ক্রাউডসোর্সিং (জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ব্যবসার মূলধন যোগানো) এর রীতি আজ সারাবিশ্বেই সমাদৃত।

- ইন্টারনেটের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাকে আরো সহজলভ্য করে তোলা: উদারনৈতিকতার এই যুগে অনলাইনে বিপুল পরিমাণ একাডেমিক বইপত্রের সাহায্য পাওয়া যায়।

- মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলে তরুণ উদ্যোক্তাদের অর্থসাহায্য নিশ্চিত করা: উচ্চমানের ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে চাকরি খোঁজা যুবকদের জন্য ভারত ও উগান্ডায় এই জাতীয় কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। তারা নতুন উদ্যোক্তা হবার পথে মূলধন যোগাড় এর পন্থা খুঁজছে এখন।

সৃজনশীল কাজের জন্য সুস্থ কর্মপরিবেশ, অর্থনৈতিক সহায়তা, একত্রিত হবার সুযোগ, এবং উর্বর আইডিয়ার বহিঃপ্রকাশ একান্ত প্রয়োজন। সৃজনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার-

- উদ্ভাবনী উন্নয়ন: নারীদের বা যারা সবচেয়ে কম উপার্জন করে তাদের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে এমন কিছু তৈরি করণ; যা তাদেরই কাজে লাগবে।

- গণতান্ত্রিক সৃজনশীলতা: এমনভাবে কর্মস্থল সাজাতে হবে যেন সব পর্যায়ে কর্মিরা যাকে বলে 'গণ্ডির বাইরে' চিন্তা করে এবং তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার ব্যবহার সব ক্ষেত্রে করতে থাকে।

স্বেচ্ছাশ্রমকে উদ্দীপ্ত করার জন্য কর মওকুফ, ভর্তুকি ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানোর কাজগুলো করা যেতে পারে। জরুরী অবস্থা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জনগণ যেন দাতব্য শ্রমে আগ্রহী হয় সেজন্য জনগণকে সুবিধাদি দিতে হবে।

সংকটকালীন ও সংকট পরবর্তী সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো মানুষের ক্ষমতায়ন, এজেন্সি নির্মাণ, কথাবলার পরিবেশ সৃষ্টি, সামাজিক অবস্থান তৈরি, বিশ্বাস, আন্তঃসংযোগ ও নাগরিক সমাজে অংশগ্রহণের মানসিকতা। আরো কিছু বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সহায়ক শ্রম: সংকট মোকাবেলা করা অনেক দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ধস নেমেছে। সেখানে আক্রান্ত শ্রমিক ও আহতদের স্বাস্থ্যসুবিধা নিশ্চিত করা জরুরী এবং আবশ্যক।

- মৌলিক সামাজিক সহায়তা চালু রাখা: এ বিষয়টির সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে, কাজেই বেসরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক সুবিধাদি পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারে।

- জনগণের জন্য শ্রমবান্ধব কর্মসূচির আয়োজন: জরুরী অথচ খণ্ডকালীন কাজের জন্য মানুষকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এতে সামাজিক ভারসাম্য সঠিক থাকবে এবং সামাজিক গঠন মজবুত হবে।

- নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ: এজাতীয় পরিকল্পনা শ্রমবাজারের স্থায়িত্ব ছাড়াও বহুমাত্রিক লাভের পথ দেখায়। মানুষের ভেতর সংযোগ ঘটানো, আগের নেটওয়ার্ক পুনরায় গড়ে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোর গতি বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়।

শ্রমবিকাশের জন্য নীতি নির্ধারণের উর্ধ্বে একটি বিস্তৃত কার্যপ্রণালী প্রয়োজন

- নতুন একটি সামাজিক চুক্তি নির্মাণ: নতুন বিশ্বের পরিবর্তিত শ্রমবাজারে এটা খুব কম দেখা যায় যে কেউ একজন একটি জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। শ্রমিকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের পেশায় থাকছে না। বিশ্বে শ্রম-নিরাপত্তার জন্য কেউ পরম্পরায় পাওয়া কাজটি করতে চায় না। এমন অবস্থায় কীভাবে সমাজ নিজে থেকে একটি বর্ধিষ্ণু জনগণের দায় গ্রহণ করবে যেখানে সবসময় সবাই কর্মরত নেই? কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্তের বাইরের মানুষদের সে চাকরি যোগাবে? নতুন শ্রমবাজারের জন্য জায়গা করে দিবে? সম্ভবত নতুন ধরনের একটি সামাজিক চুক্তির প্রয়োজন, যেখানে শ্রমবাজারের পরিসরটি বিংশ শতাব্দীর চেয়ে আরেকটু বড় হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ডেনমার্ক কর্মদক্ষতার নিরাপদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি ক্রমবর্ধমান শ্রমবাজারের দিকে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে।

বাক্স ৪: ডেনমার্কের 'ফ্লেক্সিকিউরিটি'

ড্যানিশ কর্মীবাজারে 'ফ্লেক্সিকিউরিটি' নামক এক ধরনের ধারণা খুবই সুলভ যা মূলতঃ শ্রমিক ও নিয়োগদাতার মধ্যে শ্রমের সুলভ মূল্য বিষয়ক বোঝাপড়া এবং নিরাপত্তার সহাবস্থান, যা মূলতঃ ডেনমার্কের সুষ্ঠু সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফল। এর ফলে কর্মী প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে উচ্চমানের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত হয়েছে ডেনমার্কে।

ফ্লেক্সিকিউরিটির মূল উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থানের নিরাপত্তার চেয়ে কর্মের নিরাপত্তা বেশি নিশ্চিত করা। অর্থাৎ কর্মসংস্থান নয় বরং কর্মীর নিরাপত্তাই মূল। এর ফলে নিয়োগকারীরা একটি নমনীয় শ্রমশক্তির সুবিধা পাচ্ছে এবং কর্মীরা শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে সক্রিয় শ্রম বাজার নীতিমালার সুবিধা নিয়ে উন্নত জীবনযাপনের প্রয়াস পাচ্ছে।
সূত্র: বিশ্বব্যাংক ২০১৫বি

- বৈশ্বিক চুক্তিতে উপনীত হওয়া: বর্তমানে এই বৈশ্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শুধুমাত্র সামাজিক ও জাতীয় চুক্তি দ্বারা সারাবিশ্বের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিজ্ঞা রক্ষা সম্ভব নয়। সত্যিকারের বিশ্বায়ন বলতে, মানুষের সাথে মানুষের দায়দায়িত্ব ভাগ করে নেয়াকে বোঝায়। আমাদের উচিত হবে 'বৈশ্বিক কর্ম জীবন' এর সাথে পরিচিত হওয়া।

যেকোনো বৈশ্বিক চুক্তির জন্য প্রয়োজন তার সকল অংশীদারদের নিজেদের ভেতরে শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরি করা। যেমন- শ্রমিকের সাথে মালিকের সম্পর্ক, সরকারের সাথে ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক প্রভৃতি। শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টি মানুষের অভ্যাসে পরিণত করা এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে আপোষের মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা থাকা বৈশ্বিক চুক্তির পূর্বশর্ত। এসব করতে নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হবে না। বিশ্বের বিভিন্ন প্রভাবশালী ফোরামগুলোর মনোযোগ পেলেই যথেষ্ট সহজ হয়ে যাবে কাজগুলো।

একটি বৈশ্বিক চুক্তি সরকারকে তার নাগরিকের চাহিদা পূরণে সহযোগিতা করে। বৈশ্বিক চুক্তিহীন অবস্থায় শুধু জাতীয় নীতিগুলো নিজস্ব ডেরার বাইরের শ্রমসম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয়। একটি জাতীয়-বৈশ্বিক পারস্পরিক চুক্তিতে শ্রমকে ছড়িয়ে দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ভেতর অনেকগুলো সংস্থা, যেমন 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা সনদ(আই এল ও)' ঘরোয়া কাজের জন্য দক্ষ শ্রমিক খুঁজছিল। তারপর সেই ২০১৩ সাল থেকে তার শ্রমবাজার বহাল থাকে। এটা একটা অভিনব চুক্তি ছিল যেখানে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বৈশ্বিকভাবে একটি সিদ্ধান্তে আসা হয়। এইজাতীয় কাজের সুযোগ শ্রমিকদের যেমন লাভবান করে তেমনি জাতীয় সরকারকেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেয়। বৈশ্বিক শ্রম-পরিকল্পনা, জাতীয় পরিকল্পনাগুলোকে প্রভাবিত করে এবং ধীরে ধীরে গ্রামাঞ্চল ও মফস্বলেও সেই পরিবর্তনের বাতাস বইতে থাকে।

- যথোচিত শ্রম কার্যক্রম বাস্তবায়ন : একটি যথোচিত কর্মপরিকল্পনার চারটি স্তম্ভ থাকে। এই কার্যক্রম ও মানব উন্নয়নের রূপরেখা একে অপরের সাথে সন্নিবদ্ধ। যথোচিত শ্রম মানব উন্নয়নের চারটি ধাপকেই ত্বরান্বিত করে। শ্রমের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধন যথাক্রমে মানুষের উপার্জন ও জীবিকার পথ সুগম করে। এগুলো সমতার জন্য একান্ত দরকারি বিষয়। মানুষের অংশগ্রহণ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্যও তা সমান গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকের অধিকার রক্ষা মানব উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও এটি মানবাধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও শ্রমের মান নির্ধারণে সহায়তা করে। সামাজিক নিরাপত্তা মানব উন্নয়নকে সামাজিক নিরাপত্তার জাল দ্বারা বেষ্টিত করে রাখে, বিভিন্ন ঝুঁকি থেকে বাঁচায় এবং সামাজিক সেবাসমূহ দেয়। মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক বিবৃতি প্রবাসের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

বাক্স ৫: সুষ্ঠু শ্রম এজেন্ডার চার সোপান

- কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং এন্টারপ্রাইজ তৈরি: অনুধাবন করা প্রয়োজন যে দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রধান পথ শ্রম। এবং এটিও অনুধাবন করতে হবে যে, এজন্য অর্থনীতির মূল কাজ বিনিয়োগ, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং টেকসই জীবিকা অর্জনের পন্থাগুলো সচল রাখা।
- কর্মক্ষেত্রের মান ও অধিকার: জনমানুষের জন্য প্রতিনিধিত্বমুলক অংশগ্রহণ এবং অধিকার ও মর্যাদা আদায়ে তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের সুযোগ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নীতিগত কাজ হলো কমপ্লায়েন্স ও অগ্রগতির পরিমাপক নিরূপণ করা।
- সামাজিক নিরাপত্তা: মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তা, যেমন স্বাস্থ্যসেবা ও অবসরকালীন নিরাপত্তা, সমাজ ও অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল অংশগ্রহণের ভিত্তি।
- শাসন ও সামাজিক সংলাপ: সরকার, কর্মী ও নিয়োগকারীদের মধ্যে সামাজিক সংলাপ বহু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুর সমাধান করতে পারে, সুশাসনকে উৎসাহিত করে, শ্রমিকদের সাথে সুস্থ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং অর্থনীতির ও সামাজিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করে।

সূত্র: আইএলও ২০০৮

বিপরীতক্রমে বলা যায়, মানব উন্নয়ন চারটি স্তম্ভকেই মজবুত করে তোলে। সামর্থ্যকে মানব উন্নয়নের দ্বারা আরো বিস্তৃত করার মাধ্যমে নতুন জীবিকা ও নতুন উদ্যোক্তার উত্থান ঘটে। মানুষের অংশগ্রহণের বিষয়টি সামাজিক বিবৃতিকে সমৃদ্ধ করে। মানব উন্নয়ন মানবাধিকারের মানোন্নয়ন করে, শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং নিরাপত্তা প্রদান করে। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যথোচিত শ্রম পরিকল্পনা মানব উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

25 YEARS
OF HUMAN
DEVELOPMENT

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দল - ২০১৫

পরিচালক এবং প্রধান রচয়িতা
সেলিম জাহান

উপ পরিচালক
এভা ইয়েসপেরসেন

গবেষণা ও পরিসংখ্যান
শান্তনু মুখার্জী (দলনেতা), মিলোরাদ কোভাচেভিচ (প্রধান পরিসংখ্যানবিদ), আস্ত্রা বোনিনি, সেসিলিয়া কালদেরোন, ক্রিস্টেল কাজাবাট, ইউ-চিয়ে শু, ক্রিস্টিনা লাংফেল্ডার, সাসা লুকিচ, তন্বি মুখোপাধ্যায়, শিবানী নাইয়ার, টমাস রোকা, হেরিবেরতো তাপিয়া, কাতেরিনা তেজেজ এবং সিমোনা জামপিনো।

প্রচার ও প্রকাশনা
বোতাগোজ আন্দ্রেইয়েভা, এলেনোর ফুর্নিয়ে-টুম্বস, জন হল, আদমির ইয়াহিচ, আনা অরতুবিয়া, জেনিফার ওল্ডফিল্ড ও মাইকেল রেডানট।

অপারেশনস ও প্রশাসন
সারানটুইয়া মেন্ড (অপারেশনস ম্যানেজার), মামায়ে গেব্রেটসাডিক, ফে হুয়ারেজ শ্যানাহ্যান ও মে উইন্ট থান।

বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনঃ ১৯৯০ সাল থেকে ইউএনডিপি প্রকাশিত উন্নয়ন বিষয়কনীতি এবং ধারার উপর প্রামানিক ও বিশ্লেষণধর্মী বার্ষিক প্রতিবেদনের সর্বশেষ সংস্করণ ২০১৫ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট আরো তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাবে hdr.undp.org। সেই সাথে আরও থাকবে অন্যান্য দলিল, জাতীয় পরিসংখ্যান এবং পেপার যার ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের পুরনো সংস্করণগুলো ছাড়াও এখানে রয়েছে আঞ্চলিক প্রতিবেদনগুলো ।

আঞ্চলিক মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনঃ গত দুই দশক ধরে আঞ্চলিক মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে যার মূল উপজিব্য বিশ্বের একেকটি অঞ্চল। এই প্রতিবেদনগুলোতে নাড়া দেবার মত বিশ্লেষণ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন পরামর্শ। এই প্রতিবেদনগুলো আফ্রিকার খাদ্য নিরাপত্তা, এশিয়ার জলবায়ু পরিবর্তন, আরব দেশগুলোতে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, মধ্য ইউরোপের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠিদের প্রতি বৈষম্য এবং লাতিন আমেরিকায় নিরাপত্তার মত বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছে।

জাতীয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনঃ ১৯৯২ সালে প্রথম জাতীয় পর্যায়ে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে ১৪০টি দেশের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৭০০-র মত জাতীয় প্রতিবেদন উন্নয়নের আঙ্গিক এবং জাতীয়নীতি কাঠামোয় তার অবস্থা তুলে ধরেছে। নারী পুরুষের বৈষম্যের কারণে উদ্ভুত দারিদ্র্য থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তনের মত বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এইসব প্রতিবেদনে।

Human Development Reports-1990-2015

1990 Concept and Measurement of Human Development
1991 Financing Human Development
1992 Global Dimensions of Human Development
1993 People's Participation
1994 New Dimensions of Human Security
1995 Gender and Human Development
1996 Economic Growth and Human Development
1997 Human Development to Eradicate Poverty
1998 Consumption for Human Development
1999 Globalization with a Human Face
2000 Human Rights and Human Development
2001 Making New Technologies Work for Human Development
2002 Deepening Democracy in a Fragmented World
2003 Millennium Development Goals: A Compact among Nations to End Human Poverty
2004 Cultural Libertyin TodayÕs Diverse World
2005 International Cooperation at a Crossroads: Aid, Trade and Security in an Unequal World
2006 Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis
2007/2008 Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World
2009 Overcoming Barriers: Human Mobility and Development
2010 TheRealWealthofNations:PathwaystoHumanDevelopment
2011 Sustainability and Equity: A Better Future for All
2013 The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World
2014 Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerability and Building Resilience
2015 Work for Human Development

United Nations Development Programme
One United Nations Plaza
New York, NY 10017

www.undp.org

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৫ মানব উন্নয়নের মুল লক্ষ্য মানুষের বেছে নেবার সুযোগ বাড়ানো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চেয়ে জীবনযাত্রার সমৃদ্ধির দিকেই নজর দেয়া এর আসল লক্ষ্য। আর এই প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ করার জন্য জরুরী হলো শ্রম, যা পৃথিবীর সকল মানুষকে বিভিন্নভাবে নিয়োজিত রাখে এবং তাদের জীবনের একটি বড় অংশ দখল করে নেয়। পৃথিবীর ৭৩০ কোটি মানুষের মধ্যে ৩২০ কোটি বৈতনিক কাজে নিয়োজিত, বাকিরা রয়েছে কোনো না কোনো সেবামূলক, সৃষ্টিশীল এবং সেচ্ছাসেবামূলক কাজে অথবা নিজেদেরকে ভবিষ্যতের শ্রমজীবী হিসেবে তৈরিতে নিযুক্ত।

মানব উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রমের সংজ্ঞা শুধু কাজ বা চাকরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর ব্যাপ্তি আরো গভীর ও বিস্তীর্ণ। তবে শ্রমের কাঠামোতে এমন কিছু ক্ষেত্র উপেক্ষা করা হয়েছে যা মানব উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ যেমন, সেবামূলক কাজ, সেচ্ছাসেবামূলক কাজ, সৃষ্টিশীল কাজ - সাহিত্য, চিত্রশিল্প ইত্যাদি।

শ্রম ও মানব উন্নয়নের সূত্রের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের যুগলবন্দী। শ্রমের দ্বারা দারিদ্র্য হ্রাস এবং সমানুপাতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে আয় এবং জীবিকার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন তরান্বিত হয়। এছাড়াও এটি মানুষের আত্মমর্যাদা বাড়ায় এবং সমাজজীবনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়। আর সেবামূলক কাজ পরিবার ও কমিউনিটির মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় করে। একত্রে কাজ করার ফলে শুধু বৈষয়িক উন্নতিই নয়, মানুষের বিবিধ জ্ঞান আহরণও হয় যা কি না সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি। আর যখন এই শ্রম হয় পরিবেশবান্ধব তখন তার সুফল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছায়। মূলত, শ্রম মানুষের সম্ভাবনা, সৃষ্টিশীলতা ও মানব কর্মশক্তির দ্বার খুলে দেয়। কিন্তু শ্রম এবং মানব উন্নয়নের মধ্যে কোনো স্বয়ংক্রিয় যোগসূত্র নেই বরং কিছু কিছু শ্রমের ফলে যেমন, বাধ্যতামূলক শ্রম - মানবাধিকার, মর্যাদা, স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা ধ্বংস করে মানব উন্নয়ন খর্ব করে। এছাড়াও কিছু কিছু বিপজ্জনক শ্রম যেমন কারখানার বিপজ্জনক কাজ, শ্রমিকদের ঝুঁকিতে ফেলে। আর যথাযথ নীতির অভাবে শ্রমের সুযোগ এবং পারিশ্রমিক দুই এর ক্ষেত্রেই বৈষম্য দেখা দেয় যা সমাজে অসমতার সৃষ্টি করে। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে শ্রম জগতে যে দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তা যেমন নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয় তেমনি কিছু ঝুঁকিও তৈরি করে। আধুনিক জগতের নতুন এই শ্রমের ধারায় আছে সমবণ্টনের অভাব তেমনি রয়েছে হার-জিত। বৈতনিক এবং অবৈতনিক শ্রমের মধ্যে সাম্যাবস্থা তৈরিও একটি বড় চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে নারীদের জন্য যারা সব ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার।

এছাড়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাজের সুযোগ তৈরিতে দরকার হবে টেকসই শ্রমের দিকে এগোনো। শ্রমের মাধ্যমে মানব উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব যখন তা সঠিক নীতির মাধ্যমে ফলদায়ক, লাভজনক এবং সন্তোষজনক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করবে; শ্রমিকের দক্ষতা ও সুযোগ বাড়াবে; তাদের অধিকার, নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করবে এবং সেই সাথে নেয়া হবে কিছু নির্দিষ্ট ইস্যু ও মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। আরো দরকার হবে নতুন সামাজিক চুক্তি, বৈশ্বিক সমঝোতা এবং সুষ্ঠু শ্রমের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা।

শ্রম জগতে 'বৈতনিক ও অবৈতনিক দুই ক্ষেত্রেই' নারীরা বৈষম্যের শিকার। বৈতনিক কর্মক্ষেত্রে তারা কাজের সুযোগ কম পায়, বেতন কম পায়, তাদের কর্ম পরিস্থিতিও নাজুক সেই সাথে রয়েছে অভাব নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী প্রতিনিধিত্বের। আর অবৈতনিক কর্মক্ষেত্রে, তাদের রয়েছে গৃহস্থালি এবং সেবার কাজের এক অসামঞ্জস্যপূর্ণ বোঝা।"

-হেলেন ক্লার্ক, ইউএনডিপি, প্রশাসক

"শিশুশ্রম কোনো বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয় এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে এর সমাধান করা সম্ভব না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আমরা যদি আমাদের শিশুদের রক্ষা করতে না পারি তবে মানব উন্নয়ন রক্ষাও হয়ে পরবে অসম্ভব। শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা আমাদের অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।"

-কৈলাস সত্যার্থী, ২০১৪ সালের নোবেল শান্তি পুরষ্কার বিজয়ী

"সৃষ্টিশীল কাজকে ধারণ করা হতে পারে কঠিন ও দুর্বোধ্য, কিন্তু সেকারণে সৃষ্টিশীলতাকে মানব উন্নয়নের একটি প্রধান উপাদান হিসেবে মেনে না নেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বর্তমান যুগে আমরা সৃষ্টিশীলতাকে মানব উন্নয়নের একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে গণ্য করে থাকি।"

-ওরহান পামুক, ২০০৬ সালের নোবেল সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ী

"ঠিক যেমন ভাবে নারীর ঘরের কাজ অলক্ষ্যে থেকে যায়, কমিউনিটি উন্নয়ন ও সংঘাত নিরাময়েও তার অবদান মানব উন্নয়নে রয়েছে যার বিশেষ তাৎপর্য - অস্বীকৃত রয়ে যায়।"

-লেয়মাহ গাকই, ২০১১ সালের নোবেল শান্তি পুরষ্কার বিজয়ী

"শ্রম, শুধু চাকরিই নয়, তা মানব উন্নতিতে অবদান রাখে ও মানব উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এই শ্রম ও মানব উন্নয়নের মধ্যে নেই কোনো স্বয়ংক্রিয় যোগসূত্র।"

- সেলিম জাহান, প্রতিবেদনের প্রধান রচয়িতা